তাখুগণই

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

তাখুকনীয়

(দুই ভাই)

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক
গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা
ত্রিপুরা সরকার

শশধর বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ প্রণীত ''তাখুকনীয়''

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭৩ইং

প্রকাশক ঃ উপজাতি গবেষণা অধিকার
ত্রিপুরা সরকার।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৫ শে জানুয়ারী, ১৯৯৯।

পুণঃমুদ্রণে ঃ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা
কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা। ত্রিপুরা সরকার।

মুদ্রণে ঃ মেগা কম্পিউটার
৬নং ঠাকুরপল্লী রোড, বিদূরকর্তা চৌমুহনী,
কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

মূল্য ঃ

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণাধিকার হতে ''তাখুকনীয়'' বা ''দু'ভাই'' নামক রূপকথাটি পুণঃপ্রকাশিত হয়ে পুস্তকাকারে বের করা হল। ইতিপূর্বে এই গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রকাশিত রূপকথাগুলো বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আশাকরি সুধী পাঠকমণ্ডলীর রসগ্রাহ্য হয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি রূপকথাই নিজস্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল এবং একটি বিশেষ আবেদন নিয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়ে থাকে।

রূপকথাগুলো চিরদিনই সাধারণের মুখে মুখে বেঁচে থাকে। তাই অনেক সময় একই রূপকথা স্থান কাল পাত্র ভেদে সামান্য পরিবর্ত্তিত হয়ে পরিবেশিত হতে দেখা গেছে। আমাদের প্রকাশিত রূপকথাগুলো সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাই-সুধী পাঠকমণ্ডলীকে সেদিকটা মনে রেখেই আমাদের প্রকাশিত রূপকথাগুলোকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করব।

এই রূপকথার বইখানি পুণঃমুদ্রিত রূপে পাঠকের দরবারে প্রকাশিত করে উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করল।

নিবেদক

এস্. কে. সরকার
অধিকর্ত্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

ঠিক আজকে আমরা যেমনটা দেখছি অনেক আগের দিনে ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলের অবস্থা তেমনটা ছিল না। আজকের মত লোকজন, রাস্তাঘাট তখনকার দিনে ছিল না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছিল সরু পায়ে হাঁটা পথ--সে পথ দিয়েই লোকজন চলাফেরা করত। পাড়াগুলোও ছিল খুব দূরে দূরে। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে কিংবা রাজধানীতে আসতে হলে হয়ত বা দু'তিন দিন ক্রমাগত হেঁটেই আসতে হত।

রাজধানী থেকে বহুদূরে পাহাড় অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর হ'ত তখনকার দিনে। তাই শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এবং সমস্ত রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক পাড়াতে বিচক্ষণ, প্রবীণ একজন লোককে নির্বাচন করা হত সর্দাররূপে। সেই হত তার পাড়ায় সর্বময় কর্তা। তাকে সবাই মেনে চলত। পাড়ার বিচার-আচার করার সম্পূর্ণ ভার থাকত তার উপরেই। সে বিচার করে যে রায় দিত সবাই বিনা দ্বিধায় তা' মেনে নিত। ক্ষেত্র বিশেষে সে প্রাণদণ্ডও দিতে পারত।

এমনি যখন রাজ্যের অবস্থা সে সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল রাংগামাটি। সেখানে রাজত্ব করতেন রাজা ফান কারাক। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ শাসক। দেশজোড়া তার সুনাম। বারখিল হালাম জাতি পার্বত্য প্রজারা তার রাজত্বে সুখে শান্তিতে বসবাস করত। বীর ফান কারাকের বীরত্বে তেমন তেমন শত্রুরাও মাথা তুলতে সাহস পেত না। রাজার রাণীর নাম ছিল নখাফিলিক। পাহাড়ী সর্দারের মেয়ে হলে কি হবে নখাফিলিকের যেমনি রূপ তেমনি তাঁর গুণ। তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ রাজা তাই আর কোন রাণী ঘরে আনেননি। নখাফিলিকই তাঁর একমাত্র রাণী--পাটরাণী। রাণীকে নিয়ে রাজার সুখের সংসার। দিন যায়। দেখতে দেখতে রাজার দুটি ছেলেও হল। বড়টির নাম কুতুংরায় আর ছোটটির নাম কুচুংরায়। দু'টি ছেলেই দেখতে খুব সুন্দর। দু'ভায়ে মিলও খুব। একসাথেই ওরা খায় দায়--খেলাধূলা করে। রাজা তাদের নিজের প্রাণের চাইতেও

বেশী ভালবাসেন। চাঁদের কলার মত রাজপুত্রেরা দিন দিন বড় হতে লাগল।

এদিকে আড়াল থেকে বিধাতা পুরুষ হাসছেন। রাজার সংসারে ঘনিয়ে এল মহা দুর্দিন। বড় রাজকুমারের বয়স যখন দশ আর ছোটটির বয়স আট বছর এমনি সময়ে রাণী নখাফিলিক অসুস্থ হয়ে বিছানা নিলেন। রাজ্যের যত ডাক্তার, বদ্যি, ওঝা, কবরেজ একে একে সবাই এসে রাণীর চিকিৎসা করল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও রাণীর অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগল। রাজা ফান কারাক সেই যে রাণীর রোগ-শয্যার কিনারে বসেছেন একটু সময়ের জন্যও তিনি নড়েন না। তাঁর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা --কি হয়! এদিকে রাজকার্যও ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারেন না রাজা; তাই রাজ্যেও নানারকম বিশৃঙ্খলা। দিন দিনই নখাফিলিকের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। রাণী বুঝতে পারলেন তিনি আর বাঁচবেন না। একদিন শংকাজড়িত স্বরে তিনি রাজাকে কাছে ডেকে এনে বলতে লাগলেন--"মহারাজ আমি হয়ত আর বাঁচব না। যতটুকু মনে হচ্ছে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। মরার আগে আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করব; রাখবে তো বলি।" মহারাজ বললেন--"রাণী, তোমার যে কোন অনুরোধ, তা' যত কঠিনই হোক নিশ্চয়ই আমি রাখব। তুমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পার।" মুমূর্ষু রাণী বললেন--"তাহলে কুতুং এবং কুচুংকে ডেকে আনাও। আমি তাদের সামনে রেখেই আমার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে যাব।" সংগে সংগে রাজা কুতুং এবং কুচুংকে ডেকে আনালেন। কুমারেরা মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। বলতে গিয়ে রাণীর চোখে বান ডেকে গেল। তিনি রাজার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন,--"মহারাজ কুতুং আর কুচুং আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন। তোমার হাতে তাদের সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মরতে চাই। তুমি যদি আবার বিয়ে কর তাহলে সৎমা এসে ওদের খুব কষ্ট দেবে। তাই তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, আমি মরে গেলে তুমি আর বিয়ে করো না। তাদের যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব না। বল, মহারাজ, তুমি আমার

মাথায় হাত রেখে বল; তুমি আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করবে।'' মহারাজও কাঁদছিলেন। তিনি বললেন--''প্রিয়তমা, কুতুঃ এবং কুচুঃ তোমার যেমনি, আমারওতো তেমনি। তাদের যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আমারও খুব কষ্ট হবে। তোমাকে ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর বিয়ে করব না।'' কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী নখাফিলিক স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাজা নীরবে কাঁদতে লাগলেন। কুমারেরা মাকে ডেকে ডেকে চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। রাজবাড়ীর সবাই তাদের স্নেহময়ী রাণীর শোকে কাঁদতে লাগল। সমস্ত রাজবাড়ীতে নেমে এল এক বিষাদের ছায়া। মহা সমারোহে যথাসময়ে রাণীর শ্রাদ্ধাদি কাজ শেষ হল।

রাজা ফান কারাক প্রিয়া বিচ্ছেদ বেদনায় মর্মদগ্ধ। তাই রাজদরবারেও আর আগের মত আসেন না। সর্বদা অন্তঃপুরেই ছেলেদের নিয়ে মেতে থাকেন। ফলে রাজ্য শাসনে দেখা দিতে লাগল ঘোরতর বিশৃঙ্খলা। সেনাপতি ও অমাত্যগণের পক্ষে সবদিক সুন্দর ভাবে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রজাদের দুঃখ কষ্ট বাড়ছে দিনের পর দিন। রাজ্যের এরকম বেহাল অবস্থা দেখে অমাত্যবর্গ, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সমেত সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি করে রাজাকে আবার শাসনকার্যে মনোযোগী করা যায় এই তাদের একমাত্র ভাবনা। একদিন পাত্রমিত্র সবাই সভা করে বসল। পত্নী বিয়োগে রাজা যারপর নাই শোকাতুর। বিয়ে করলেই হয়ত আবার তাদের মহারাজা রাজকার্যে মনোযোগী হবেন। সবাই আলোচনা করে ঠিক করল--রাজাকে আবার বিয়ে করতে হবে। তাহলে হয়ত তার পরিবর্ত্তন হবে। অমাত্যগণ মহারাজার আত্মীয় স্বজনদের সংগেও অনেক পরামর্শ করলেন। আত্মীয় স্বজনও রাজার বিয়ের স্বপক্ষেই অভিমত জানাল। একদিন প্রধান অমাত্য কথা প্রসঙ্গে রাজার কাছে বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। রাজা অমাত্যের কথায় একটুও আমল দিলেন না। রাজা কিছুতেই আবার বিয়ে করতে রাজী হলেন না। প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন রাজাকে পুনরায় বিয়ে করার স্বপক্ষে বহুতর যুক্তি দেখাল। কিন্তু রাজা কারো কথাতেই সম্মতি জানালেন না। বিয়ে করবেন

না বলে সেই যে রাজা এক কথা বলে বসে আছেন তার থেকে কিছুতেই তাঁকে নড়ানো গেল না। অন্য একদিন প্রধান অমাত্য রাজাকে নিভৃতে বলল--"মহারাজ, আপনি যদি আবার বিয়ে না করেন তাহলে আপনার এ বিশাল সংসার দেখবে কে ? রাজ্যের রাজলক্ষ্মীই যদি না রইল তবে বিশেষ অমংগল হওয়ার আশংকা রয়েছে।" সেনাপতি কিতিংরায়ও প্রধান অমাত্যের কথা সমর্থন করল। প্রধান অমাত্য আরও বলল--"আমি সর্বসুলক্ষণা রাজলক্ষ্মী হওয়ার উপযুক্ত একটি মেয়ে দেখে রেখেছি। এখন মহারাজের আদেশ হলেই মেয়েটিকে রাণীমা করে আনার বন্দোবস্ত করতে পারি।" এবার মহারাজ যেন একটু বিরক্তই হলেন। তিনি খানিকটা বিরক্তি মিশিয়েই বললেন--"তা হয় না অমাত্য, তা হয় না। তোমাদের রাণীমা মৃত্যু শয্যায় আমাকে আবার বিয়ে করতে বারণ করে গেছেন। আমিও তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আবার বিয়ে করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভাংতে পারি না। আমাকে তোমাদের রাণীমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে দাও।" একটা দীর্ঘশ্বাস যেন রাজার অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এল। প্রধান অমাত্য সেদিনকার মত সেখানেই চুপ করে রইল।

এদিকে প্রধান অমাত্য মহারাজকে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী করাতে না পেরে একটা কৌশল অবলম্বন করল। সে রাজ্যের প্রত্যেক পাড়ায় সর্দারদের খবর পাঠাল রাজবাড়ীতে এসে জমায়েত হতে। এবং সাথে সাথে রাজার সম্মুখে এসে কি বলতে হবে তাও বলে পাঠাল। নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের বিভিন্ন পাড়া থেকে সর্দারগণ এসে রাজবাড়ীতে হাজির হল। সর্দারগণ সবাই মহারাজার দর্শন প্রার্থী। সভা বসেছে। পাত্রমিত্র, পারিষদ এবং অমাত্যবর্গ যার যার নিজ নিজ আসনে বসেছে। সর্দারগণও তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসেছে। খবর পেয়ে মহারাজ ছেলে দুটির হাত ধরে এসে সিংহাসনে বসলেন। মহারাজের মুখমণ্ডল বিমর্ষ; সারামুখ যেন কালিতে ছেয়ে গেছে। প্রধান অমাত্য একে একে প্রত্যেক সর্দারকে ডাকতে লাগলেন। তারা একজন একজন করে এসে জোড়করে মহারাজের নিকট তাদের প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগল। তারা বলতে

লাগল--"ধর্মাবতার , মহারাজ, আপনি আমাদের পিতা--আমাদের প্রতিপালক। আমারা আপনার সন্তান। আজ আমাদের মা নেই। কে মাতৃহারা সন্তানদের প্রতিপালণ করবে ! তাই আমরা অনাথ। ধর্মাবতার মহারাজের আজ্ঞা হলে আমরা আমাদের মাকে ফিরে পেতে পারি। মহারাজকে তাঁর সন্তানদের মনোবাসনা পূরণ করতে আজ্ঞা হয়।" সুযোগ বুঝে প্রধান অমাত্য সর্দারদের কথায় সমর্থন জানাল। প্রজাবৎসল মহারাজ উভয় সংকটে পড়লেন। একদিকে নিজের প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে অনুগত প্রজাদের প্রার্থনা। কি করা যায় ! মহারাজ ভাবতে লাগলেন, চন্দ্রবংশের রাজা তিনি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ চিরদিন প্রজাকুলের মনোরঞ্জন করেই এসেছেন। প্রজার মংগলার্থে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। তাই আজ তাঁর পক্ষে পিতৃপুরুষের মান রক্ষার্থেই নিজের প্রতিজ্ঞা ভংগ করতে হচ্ছে। তাঁকে বিয়ে করতে হবে। এসব কথা ভেবে চিন্তে রাজা মহা সমস্যায় পড়লেন। অনেক ভাবনার পর শেষ পর্যন্ত প্রজাদের প্রার্থনাই পূরণ করতে মনস্থ করলেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন--"আচ্ছা, তোমরা যখন এত করেই বলছ, তাহলে তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হোক।" এই বলে রাজা ছেলে দুটির হাত ধরে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন।

বিবাহে রাজার সম্মতি পেয়ে প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও অন্যান্য পারিষদেরা আহ্লাদে আটখানা। রাজা বিয়ে করবেন, আগের মত আবার কাজে মনোযোগী হবেন, রাজ্যব্যাপী আনন্দের বান ডেকে যাবে, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ! প্রধান সেনাপতি কিতিংরায়ের সংগে পরামর্শ করে চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিল সর্বসুলক্ষণা রাজরাণী হওয়ার উপযুক্ত একটি মেয়ে খুঁজে বের করতে। রাজার লোকেরা সারা দেশ চষে ফেলল একটি সুন্দরী মেয়ের জন্য। শেষ পর্যন্ত দূর গাঁয়ে নিক্রা সর্দারের পাড়ায় একটি সুন্দরী মেয়ের খবর পাওয়া গেল। সেনাপতি কিতিংরায় এ সংবাদ পেয়ে অন্যান্য অমাত্যদের নিয়ে নিক্রা সর্দারের পাড়াতে গিয়ে হাজির হল মেয়েটিকে দেখতে। মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হল। মেয়ের নাম নাইথকতি। নিক্রা

সর্দারও রাজার কাছে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে বলে খুবই আনন্দিত। খুব পান ভোজন হল। বিয়ের কথাও পাকা হল। বিয়ের যাবতীয় কথাবার্ত্তা ঠিক করে সেনাপতি কিতিংরায় রাজধানীতে ফিরে এসে প্রধান অমাত্যকে সকল বিষয় জানাল।

প্রধান অমাত্য যথাসময়ে মহারাজার নিকট সমস্ত কিছু বৃত্তান্ত নিবেদন করল। মহারাজা প্রধান অমাত্যকে সম্মতি দিলে প্রধান অমাত্য এক শুভদিনে মহারাজার বিয়ের দিন ধার্য করল। বিয়ে হতে বেশ কিছুদিন এখনও বাকি। এখন থেকেই রাজ্যজোড়া আনন্দের ঢেউ বয়ে গেছে। বিয়ের দিন রাজা প্রচুর লোকজন, হাতী-ঘোড়া নিয়ে মহাসমারোহে নিক্রা সর্দারের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। প্রচুর আনন্দ স্ফুর্তি, পান ভোজনের মধ্য দিয়ে রাজার বিয়ে শেষ হল। রাজা নব বিবাহিতা স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ। রাজার আনন্দ দেখে প্রধান অমাত্যও খুব খুশী। যা হোক্ এবার তাহলে মহারাজার মন ফিরবে। তিনি রাজকার্যে মনোযোগী হবেন। এবার রাজধানীতে ফেরার পালা। নিক্রা সর্দার মেয়ের বিয়েতে যথাসাধ্য দানসামগ্রী দিয়েছিল। রাজা কিন্তু কোন কিছুই আনতে চাইলেন না। শুধুমাত্র হাতের তৈরী কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আছে জানিয়ে রাণী একটা বড় সিন্দুক সংগে নেওয়ার জন্য রাজার অনুমতি নিয়ে নিলেন। যাবার দিন সমস্ত গাঁয়ের লোক নদীর ঘাটে এসে জমা হয়েছে। নিক্রা সর্দার, তার স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনেরা প্রচুর কান্নাকাটি করতে লাগল। মেয়ে তাদের চলে যাচ্ছে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! রাজা রাণীকে নিয়ে নৌকাতে গিয়ে বসলেন। নৌকার যেখানে বড় সিন্দুকটি রাখা হয়েছিল রাজা ও রাণী তার পাশটিতেই গিয়ে বসলেন।

রাজা নুতন রাণীকে নিয়ে বাড়ীতে এসে পৌঁছলেন। নুতন রাণী আসাতে রাজধানীতে আনন্দের জোয়ার ডেকে গেল। পাইক বরকন্দাজেরা রাণীর কথামত বাপের বাড়ী থেকে আনা বড় সিন্দুকটি রাণীর শোবার ঘরের

এককোণে এনে রাখল। রাজা অন্তঃপুরে এসে প্রবেশ করলেন। এ কয়দিনে বিয়ের হৈ হট্টগোলে ক্লান্ত রাজা বিশ্রাম করতে লাগলেন। পরদিন রাজা কুমার কুচংরায় এবং কুতুংরায়কে নিজের কাছে ডেকে আনালেন। রাণী রাজার পাশেই বসে আছেন। কুমার দু'জন এলে রাজা রাণীকে বললেন--"রাণী আজ থেকে আমার দুটি ছেলে কুচুং এবং কুতুংকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। এদেরকে তুমি নিজের পেটের ছেলে বলে মনে করবে; ওরা আমার চোখের মণি। ওদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলে আমি মনে খুব ব্যথা পাব।" রাণীও ফুটফুটে ছেলে দুটিকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন। নানারকম গল্প-গুজব করে ছেলেদের মন জয় করে নিতে লাগলেন। মাতৃহারা কুমার দুটিও আজ মা বলে ডাকতে পেরে খুব খুশী। কতদিন ধরে ওরা ওনামে কাউকে ডাকতে পারেনি। কুমারদের সাথে রাণীর ব্যবহারে রাজা খুব খুশী। যাহোক মা হারা ছেলে দুটি আবার মা ফিরে পেয়েছে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই রাণী তার নিজের ব্যবহারে এবং মিষ্টি কথায় দাসদাসী থেকে সুরু করে সবার মন জয় করে নিল। রাজাও নুতন রাণীর ব্যবহারে ভুলে গেলেন। আজকাল রাজার নখাফিলিকের কথা খুব একটা মনেই পড়ে না। রাজা নুতন রাণীর কথায় খুব বিশ্বাস করেন-- বলতে গেলে রাণীর কথা মতই তিনি অন্তঃপুরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

দেখতে দেখতে বছরটা ঘুরে এল। কুমার কতুং এবং কুচুংকে রাণী আর আগের মত দেখতে পারে না। কুমার দুটি ছায়ার মত সব সময়ই মহারাজের সাথে সাথে থাকে। অন্তঃপুরে এলেও রাণী যে রাজার সাথে দু'একটি সোহাগের কথা বলবেন তার সুযোগ থাকে না। এছাড়া ভবিষ্যতের চিন্তা প্রায়ই রাণীর মনে নাড়া দিয়ে যায়। রাণী ভাবে, রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী রাজার অবর্ত্তমানে বড় কুমারইতো রাজা হবে। রাণীর ঘরে ছেলে হলেও সিংহাসনের প্রতি তার কোন দাবীই থাকবে না। চিরদিন তার ছেলেকে সতীনের ছেলেদের কাছে মাথা নত করেই থাকতে হবে। রাণী যতই ভাবেন ততই এ চিন্তাটা তার মনকে অস্থির করে তোলে। তাইতো, পথের কাঁটা দুটোকে যে করেই

হোক সরাতে হবে। রাণী মনে মনে খুব হিংসা করলেও মুখে কিন্তু কিছুই প্রকাশ করল না। বুদ্ধি খেলিয়ে রাজাকে দিয়েই সব করাবে বলে ঠিক করল। তাই একদিন রাজা অন্তঃপুরে এলে রাণী বলল--"সব সময় তুমি তোমার ছেলেদের কাছে কাছে রাখছ, তাদের নিয়েই তুমি বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাক। দু'দণ্ড একান্তে বসে আমার সাথে যে একটু কথা বলবে তারও ফুরসৎ তোমার হয়ে উঠে না। তোমার সাথে যে মাঝে মধ্যে একটু মনের কথা বলব তাও পেরে উঠি না। ছেলেরা দিন দিন বড় হচ্ছে। তাদের সামনেতো আর [illegible] খুলেও বলা যায় না।" রাজা দেখলেন, ঠিকইতো, ছেলেরা বড় হচ্ছে। তাদের সামনেতো আর রাণীকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা উচিত নয়। কালই ওদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পরদিনই রাজা একজন বিশ্বস্ত ধাইমাকে ডেকে পাঠালেন। তার প্রতি আদেশ রইল, রাজা যখন রাণীর মহলে থাকবেন তখন যেন কুমারদের তার নিকট আসতে দেওয়া না হয়। ধাইমার কাছেই কুমারদের রাত্তিরে শোবার জায়গা করা হল। ধাইমাই কুমারদের যাবতীয় দেখাশুনার কাজ করবে। তখন থেকে কুমারেরা ধাইমার সাথেই এক ঘরে থাকতে লাগল।

এদিকে দিন দিন রাজা রাণীর মোহে পড়ে রাণীকে নিয়েই মেতে রইলেন। কচিৎ কদাচিৎ ছেলেদের খোঁজ খবর করেন। মৃতা রাণী নখাফিলিকের কথাতো একদমই ভুলে গেলেন। রাজ কার্যেও যেন আগের মত মন দিতে পারছেন না। তবে আগের মতই তিনি মাঝে মাঝে শিকারে বের হন। শিকারে হরিণ, খরগোশ, শূকর প্রভৃতি পাওয়া যায় প্রচুর। এমনি একদিন শিকারে গিয়ে রাজা একটি সুন্দর ময়নার বাচ্চা এনে কুমারদের দিলেন। কুমারেরা বাচ্চাটিকে খাঁচায় পুরে রাখে, সময় মত স্নান করায় পোকা মাকড় এনে খাওয়ায়। এদিকে কোন কারণ না থাকলেও কুমারদের প্রতি রাণীর বিরক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল। ওদের দেখলেই সব সময় রাণী খিটমিট করে। অনেক সময় রাজা সামনে থেকেও রাণীর এসব দুর্ব্যবহার লক্ষ্য

করতেন। কিন্তু রাজা রাণীকে কিছুই বলতে সাহস পেতেন না। ছোট হলেও কুমারেরা এসব বুঝত। তাই ওরা সহজে বাবার কাছে ঘেঁষতে চাইত না। রাজা যখন একা একা থাকতেন একমাত্র তখনই কেবল কুমারেরা বাবার কাছে যেত। কুতুং কুচুং এর চাইতে বড়। সে বাবার কাছে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করত না। বাবার কাছে না গেলেও তার চলত। কুচুং ছোট বলে তারই বাবার জন্য বেশী মন কাঁদে। মা যখন কাছে থাকত না তখনই সে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একদিন কুচুং বাবার খোঁজে মার ঘরে গিয়ে উঁকি দিল। কিন্তু বাবা কোথায় ? বাবাকে কুচুং দেখতে পেল না। কিন্তু মা ওগুলো কি করছে ! অনেকগুলো সন্দেশ থালাতে সাজিয়ে বড় সিন্দুকটার ডালা খুলে ভিতরে রাখছে কেন ? কুচুং ভাবল, মা হয়ত সিন্দুকের ভিতরে কোন দেবতার পূজা দিচ্ছে। থাকগে--কুচুং চুপি চুপি পালিয়ে এল। এ বিষয়ে সে আর কাউকে কিছু বলল না।

অনেকদিন ধরে কুচুং বাবাকে দেখেনি। বাবাকে দেখার জন্য তার মনটা আনচান করছে। এদিনও সে বাবার খোঁজে খোঁজে সৎমার ঘরে গিয়ে উঁকি দিল। সেদিনও সে বাবাকে দেখতে পেল না। কিন্তু সেদিন সে একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করল। সে দেখল, তার মা সিন্দুকের ডালাটা খুলে কার সাথে যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। সিন্দুকের ভিতরে থেকে আর একটা লোক যেন তার মার কথার উত্তর দিচ্ছে। আচমকা কুচুং ভয় পেয়ে গেল। তাড়তাড়ি সে সেখান থেকে পালিয়ে এল। সৎমা যদি কোনমতে তাকে দেখতে পায় তাহলে আস্ত রাখবে না।

দূর পাহাড় অঞ্চল থেকে খবর এসেছে, কুকিরা রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের উপর খুব অত্যাচার সুরু করেছে। কাউকে সুখে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। জোর করে ধান চাল সব কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজাকেও আর তারা মানছে না। এ খবর রাজা ফান কারাকের কানে পৌঁছতেই তিনি সেনাপতি কিতিংরায়কে এবং সংগে প্রচুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। এদের

কিছুতেই আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এদিকে রাজা রাজধানী থেকে চলে যাওয়ার পর রাণী নাইথকতি সুযোগ পেয়ে বসল। যখন তখনই সিন্দুকের ডালা খুলে লোকটাকে বের করে আনত। আর তাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করত। দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণীদের উপর আদেশ ছিল, রাণী না ডাকলে কেউ যেন তার ঘরে না ঢোকে। তাই কেউ তার ঘরে ঢুকত না। রাণী যে লোকটাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করত তাই এ খবরও কেউ জানত না।

সিন্দুক থেকে যে লোকটা বেরিয়ে আসত তার নাম ফটিকরায়। বাড়ী নিক্রা সর্দারের পাড়াতে। রাণী নাইথকতির বাপের বাড়ীর পাশেই ছিল ফটিকরায়ের বাড়ী। বিয়ের অনেক আগে থেকেই ফটিকরায়ের সংগে নাইথকতির ভাব ছিল। ফটিকরায়ই বুদ্ধি করে নাইথকতিকে বড় সিন্দুকটা জুগিয়ে দিয়েছিল। নিক্রা সর্দারের বাড়ীতে থাকতেই ফটিকরায় এ সিন্দুকের ভিতরে থেকে থেকে অনেকদিন নাইথকতির সংগে মিলিত হয়েছে। একথা নিক্রা সর্দার কিংবা তার বাড়ীর কেউ জানত না। রাজার সংগে বিয়ে ঠিক হলে ফটিকরায়ই শিখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে সিন্দুকটা রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে। তার বুদ্ধিতেই নাইথকতি সিন্দুকটা সংগে করে এনে রাজবাড়ীতে অন্তঃপুরে এনে রেখেছিল। রাজবাড়ীতে এসেও তাদের প্রণয়লীলা আগের মতই চলতে লাগল। এতবড় সিন্দুকটাতে কি আছে রাজা কোনদিন জানতেও চাননি কিংবা কৌতূহলও প্রকাশ করেন নি। রাণী রাজাকে ভুলিয়ে রাখলেন। ওদিকে ছেলেরা যখন তখন মায়ের ঘরে এলে কখন ওদের নজরে পড়ে যায় এই ভয়ে রাণী কৌশলে ছেলেদেরও নিজের কাছ থেকে এবং রাজার কাছ থেকে সরাল। এছাড়া দাস-দাসীতো রাণীর বিনা অনুমতিতে ঘরেই ঢুকবে না। কাজেই সব দিক মোটামুটি গুছিয়েই চালিয়ে নিচ্ছিল রাণী।

রাজা যুদ্ধে গেছেন। কুমারেরা ধাইমার কাছে। ভরদুপুরে রাজ বাড়ীর দাসদাসীরা যার যার কাজে ব্যস্ত। এমনি সময়েই প্রত্যেক দিন রাণী সিন্দুকের ডালা খুলে ফটিকরায়কে বের করে তার সাথে আমোদ-আহ্লাদ করে। সেদিন

দুপুর বেলা হঠাৎ কুমারদের পোষা ময়নার ছানাটা খাঁচা থেকে বেড়িয়ে গেল। উড়তে উড়তে ছানাটা এ ঘর সে ঘর করছে। আর কুমারেরাও পিছু পিছু ধাওয়া করছে। এক সময়ে ময়নার ছানাটা উড়তে উড়তে রাণীর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। কুমারেরাও তার পিছু পিছু মায়ের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ওরা দেখল ওদের মা একজন অচেনা পুরুষকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। তার গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক নেই। মায়ের এ অবস্থা দেখে ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতাহীন কুমার দুটিও লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। আসার সময় বড় কুমার তার গায়ের চাদরখানা দিয়ে আলগোছে মাকে ঢেকে দিয়ে এল। অবশ্যি ময়নার ছানাটিকে সংগে নিয়ে এল। নিজের ঘরে এসে কুমারেরা নিজেদের খেলায় মন দিল।

এদিকে রাণী ঘুম থেকে উঠেই নিজের গায়ে কুতুং এর চাদরখানা জড়ানো দেখে সাংঘাতিক রকম ভয় পেয়ে গেল। নিশ্চয়ই পাজি ছেলেটা এ ঘরে এসেছিল। নয়ত ওর গায়ের চাদরখানা এখানে এল কেমন করে। এটা তার কাজ না হয়েই যায় না। ভয়ে রাণীর মুখখানা শুকিয়ে চুণ হয়ে গেল। এমন সময় ফটিকরায় রাণীকে আশ্বাস দিয়ে বলল--"নাইথক, আমি একটা বুদ্ধি বাতলেছি। আমার কথামতো ঠিক ঠিক কাজ করলে তুমিও বেঁচে যাবে; আপদ দুটোকেও জন্মের মত বিদায় করতে পারবে। শুনেছি, রাজা যুদ্ধ জয় করে দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসছেন। তুমি রাজা আসার আগেই নিজের বিছানার নীচে কতগুলো খোলামকুচি ও তরজা করা মুলিবাঁশ বিছিয়ে শুয়ে থাকবে। আর কিছুক্ষণ পর পর এপাশ ওপাশ করতে থাকবে। মাঝে মাঝে শরীর বিষ ব্যথা করছে বলে চীৎকার দিতে থাকবে। তারপর রাজা এলে আমি যে ভাবে বলে দিলাম সে ভাবে বলবে। এরপর যা করবার আমিই করব। তুমি কিছু ভেব না। খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যাও, নতুবা দুজনকেই খুব বিপদে পড়তে হবে।" যেই কথা সেই কাজ। সেদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফটিকরায় কতগুলো খোলামকুচি আর তরজা করে মুলিবাঁশ এনে রাণীর বিছানার নীচে সুন্দর ভাবে পেতে দিল। একটু নড়লেই যাতে তরজাগুলো মুড়মুড় করে উঠে। পরদিন

ভোর থেকেই রাণী তার বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে আর চীৎকার দিচ্ছে । সবাই জানতে পারল রাণীর কঠিন অসুখ হয়েছে। এ খবর নিয়ে দাসদাসীরা ছুটল প্রধান অমাত্যের কাছে। রাণীর অসুখের খবর শুনে প্রধান অমাত্য রাজ্যের সেরা সেরা বৈদ্যদের ডেকে পাঠলেন । মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেওয়া হল । ভাল ভাল নামকরা ওঝাদের ডেকে 'দিশা' (ওঝারা ধ্যানে বসে রোগ হওয়ার কারণ নির্ণয় করাকে 'দিশা' দেখা বলা হয়) দেখানো হল-- হল বিভিন্ন ভাবে ঝাড়ফুক । কিন্তু কার কি ! রাণীর অসুখ সারার কোন লক্ষণই দেখা গেল না । বরং দিন দিন যেন অসুখ বেড়েই যেতে লাগল । রাজবাড়ীর কারো চোখে ঘুম নেই । চোখেমুখে উৎকন্ঠা, প্রধান অমাত্য চিন্তান্বিত । কি করবে কি না করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না ।

যুদ্ধ জয় করে মহারাজা রাজ্যে ফিরে এসেছেন । মহারাজার আসার সংবাদ পেয়ে রাণীর অসুখ যেন আরও বেড়ে গেল। রাণী ঘন ঘন অজ্ঞান হতে লাগল । হাত পায়ের খিচুনীও যেন বেড়ে গেল অবিশ্বাস্যভাবে । যন্ত্রনায় রাণী যতই বিছানার উপর নড়াচড়া করছে ততই খোলামকুচি ও তরজাগুলো মুড়মুড় করে উঠছে--শুনলে মনে হয় রাণীর হাড়গুলোই যেন ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ দেখে ওঝা বদ্যি কেউ কিছু বলতে পারছে না। রাজধানীতে পৌঁছেই রাজা শুনলেন রাণীর উৎকট অসুস্থতার কথা। আরও শুনলেন, কোন ওঝা বদ্যিই রাণীর রোগ নির্ণয় করতে পারছে না। নখাফিলিক একবার তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। নাইথকভিও যদি তার মতই ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তাহলে এ সংসারে তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন । ব্যস্ত সমস্ত রাজা তৎক্ষনাৎ অন্তঃপুরে চলে গেলেন । রাণীর মরনাপন্ন অবস্থা দেখে এবং রোগ-যন্ত্রনার চীৎকার শুনে রাজা খুব মুষড়ে পড়লেন । রাজ্যের সবচাইতে সেরা ওঝাকে সংগে সংগে তলব করলেন । কিন্তু সেও হার মানল । কিছুতেই রাণীর রোগ নির্ণয় করতে না পেরে হেঁট মুখে রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল । রাণীর অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না । বরঞ্চ দিন হতে দিন রাণীর অবস্থার অবনতিই হতে লাগল ।

রাণীর কঠিন ব্যধির কথা মুখে মুখে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। রাজা ঘোষনা করেছেন, যে রাণীকে আরোগ্য করতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ মোটা পুরস্কারের লোভেও এগিয়ে এল না। এমনি দিনে একদিন অমাত্য কাচাগরায় বিকালবেলা রাজবাড়ীর সামনে তার নির্দিষ্ট বৈঠকখানায় বিষন্নমুখে বসে আছে। সে ভাবছে, রাণীমার এমন কি কঠিন অসুখ করল যে রাজ্যের বড় বড় ওঝা বদ্যিরাও কিছু একটা হিল্লে করতে পারছে না। এমন সময় একজন অচেনা লোক এসে জানাল, সে একজন দিয়ারী। ধ্যানে বসে রাণীর অসুখের খবর বলে দিতে পারবে। এবং তাকে ভালও করে দিতে পারবে। তার কথা শুনে অমাত্য কাচাগরায় খুব খুশী হল। এদ্দিন পর যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল। সংগে সংগে অন্দরমহলে মহারাজার নিকট খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল। মহারাজাও তক্ষুনি দিয়ারীকে অন্দরমহলে নিয়ে যেতে আদেশ পাঠলেন। মহারাজা স্বয়ং এগিয়ে এসে দিয়ারীকে রাণীর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। দিয়ারী রাণীকে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে মুখ ভার করে ফেললল। দিয়ারীর গম্ভীর মুখ উপস্থিত সকলের চিন্তা বাড়িয়ে দিল। রাজা অস্থির হয়ে বারবার বলতে লাগলেন--"বল দিয়ারী, রাণী কি করলে ভাল হবে ? তুমি যে করে হোক তাকে ভাল করে দাও। চাইকি, আমার রাজ্যের সমস্ত ধন সম্পত্তির বিনিময়ে হলেও এবার ওকে বাঁচিয়ে তোল।" রাজার অস্থিরতা দেখে দিয়ারী মনে মনে খুব খুশী। একসময় দিয়ারী গম্ভীর মুখে বলল--"মহারাজ, রাণীমার কঠিন রোগ হয়েছে। এ রোগ হলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। এ রোগের নাম 'মুড়মুড়ি রোগ'। এ রোগের চিকিৎসাও বিদঘুটে ও কঠিন। একমাত্র রাণীমার সন্তানের রক্ত দিয়ে রাণীমাকে চান করালেই রাণীমা এ যাত্রা বেঁচে যেতে পারেন। নয়ত কোন ওঝা বদ্যিই তাঁকে ভাল করতে পারবে না।" এ কথা শুনে রাজা রাণীকে বাঁচাবার আশা ছেড়েই দিলেন। রাণীর যে কোন সন্তানই নেই। তাই তাকে তার সন্তানের রক্ত দিয়ে চান করানোও হবে না, আর এ কঠিন রোগ থেকে তাকে বাঁচানোও যাবে না। রাজা দিয়ারীকে বললেন--"তা কি করে সম্ভব হবে দিয়ারী, রাণীর যে

কোন সন্তানই নেই ! এ রোগের কি আর অন্য কোন প্রতিকার নেই ? বল দিয়ারী, এ রোগের আর অন্য কি প্রতিকার আছে ? তুমি যা চাইবে তাই দিয়ে তোমাকে খুশী করব; তা যত কঠিনই হোক আগে তা পালন করব।'' এবার দিয়ারী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শেষ মুহূর্তে যাওয়ার আগে সে গম্ভীর হয়ে বলল--''মহারাজ, রাণীমাকে বাঁচাতে হলে এই একমাত্র পথ। অন্তত আমার ধ্যানে তো তা-ই নির্দেশ দিচ্ছে। এছাড়া যে অন্য কোন পথই দেখছি না। তবে--'' এটুকু বলেই দিয়ারী থেমে গেল। মহারাজ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন--''তবে কি, থেমে গেলে কেন ? কি বলতে চাও তুমি দিয়ারী ?'' ''তবে--মহারাজ, যদি আমাকে অভয় দেন তাহলে আমি অন্য একটা পথের কথা বলতে পারি।''মহারাজ বললেন--''হাঁ, হাঁ, আমি তোমাকে অভয় দিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বলতে পার।'' এবার দিয়ারী খুব আস্তে আস্তে বলল--''অন্য পথটি আপনার ছেলে দু'টিকে কেটে যদি তার রক্ত দিয়ে চান করান তাহলেও এ যাত্রা রাণীমা বেঁচে যেতে পারেন।'' একথা বলেই দিয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

একথা শুনেই রাজা সেই যে কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসলেন--আর মাথা তুলছেন না। তিনি কত কি ভাবছেন ! একদিকে প্রিয়তমা পত্নী নাইথকভি, অন্যদিকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছেলে দু'টি। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখবেন তিনি। মহা সমস্যায় পড়লেন রাজা। ওদিকে সময়ও বেশী নেই। যা' করার তা, আজকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সমস্যায় কি করা কর্ত্তব্য প্রধান অমাত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ। প্রধান অমাত্য কিছুই বলতে পারল না। শুধু অশ্রুসজল চোখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সারাটা দিন মহারাজ শুধু চিন্তাই করলেন। দিনের শেষে সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ছেলে দু'টির রক্ত দিয়েই রাণীকে চান করিয়ে সুস্থ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাণী যদি বেঁচে থাকে তাহলে আরও ছেলেমেয়ে হবে। তাই রাণীকেই বাঁচানো দরকার। রাজার সিদ্ধান্ত শুনে রাজবাড়ীময় হায় হায় রব পড়ে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে সবাই কাঁদতে লাগল। রাজার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ

ফুটে কেউ কিছু বলতেও সাহস পেল না। শয়তানী রাণীর কু-মতলব এভাবেই সফল হতে চলল।

কলকরায় রাজবাড়ীর জল্লাদ। রাজা যাদের মৃত্যুদণ্ড দিতেন কলকরায় তাদের শিরোচ্ছেদ করত। ছোটবেলা থেকেই কলকরায় মায়ের সাথে রাজবাড়ীতে আছে। তার মা রাজবাড়ীর অন্দরমহলের খুব পুরানো এবং বিশ্বস্ত দাসী। তার কাছেই কুমার কুতুং এবং কুমার কুচুং এর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন মহারাজা। রাজকুমার দু'টিকে কলকরায়ের মা নিজের ছেলের মত স্নেহে পালন করত। পরদিনই মহারাজ কুমার কুতুং এবং কুচংকে বলি দিয়ে ওদের রক্ত এনে দিতে আদেশ দিলেন। একে একে এই দুঃখজনক রাজাদেশের সংবাদ প্রধান অমাত্য, সেনাপতি প্রত্যেকের কানেই গেল। যে শুনছে সেই সেই 'হায় হায়' করছে। আর বলা বলি করছে, আমাদের বিচারক দয়ালু মহারাজের আজ এরকম দুর্মতি হল কেন! তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধিইবা লোপ পেল কেন! রাণী নাইথকভিকে বিয়ে করার পর থেকেই যেন মহারাজা কেমন হয়ে গেছেন। প্রধান অমাত্য মহারাজার সংগে দেখা করে বলল--"মহারাজ ধর্মাবতার আমার মনে হয় অচেনা অজানা সামান্য এক দিয়ারীর কথায় সত্য মিথ্যা বিচার না করে আপনার একমাত্র বংশধরদের বধ করা ঠিক হচ্ছে না।" রাজার বুদ্ধিশুদ্ধি সত্যিই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি আজ ভালমন্দ কিছুই বিচার করতে পারছেন না। তিনি প্রধান অমাত্যকে বললেন--"দেখ অমাত্য, আমি খুব বিচার করে দেখেছি। যদি দিয়ারীর কথাই ঠিক না হবে তবে ধ্যানে বসে সে এমন কথা বলবে কেন? এতে তার লাভালাভতো কিছুই দেখছি না। দিয়ারী ঠিক ঠিকই বলেছে। তোমরাইতো দেখে শুনে আমাকে বিয়ে করিয়েছিলে। রাণী যদি না-ই বাঁচে তবে আমার সুখ কোথায়? আমি কি নিয়ে বাঁচব! রাণী বেঁচে থাকলে আমার আরও সন্তানাদিও হবে। তাই তোমরা আমাকে আর বাধা দিও না। ছেলে যায় যাক তবু রাণীকে বাঁচাতে হবে। রাজার মুখের উপর কেউ আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। সকলেই চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে গেল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, রাজার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নয়ত এমন

সোনার টুকরা, নির্দোষ ছেলে দু'টিকে কি কেউ বধ করার আদেশ দিতে পারে ! আর রাণীরইবা কি রাক্ষুসে রোগ হলরে বাবা; রোগের নাম নাকি "মুড়মুড়ি রোগ"। এমন রোগের নামতো কোনদিন শুনিওনি। কি জানি বাপু, কোন্ অপদেবতা যে রাণীকে ভর করেছে কে জানে।

সন্ধ্যার একটু আগেই জল্লাদ কলকরায় ছেলে দুটিকে নিয়ে দক্ষিণ শ্মশানে চলল। সন্ধ্যার একটু পরেই কুমারদের রক্তে রাণীকে চান করাতে হবে। সংগে আছে ধাইমা, প্রধান অমাত্য এবং সেনাপতি সবাই কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। বধ্যভূমিতে পৌঁছে ধাইমা কুমারদের বুকে জড়িয়ে স্বর্গগতা রাণী নখাফিলিকের নাম ধরে বিলাপ করতে লাগল। যে করেই হোক কুমারদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতে প্রধান অমাত্য এবং সেনাপতিকেও খুব অনুরোধ করতে লাগল। কুমার কুতুং বয়সে শিশু হলেও খুব বুদ্ধি রাখে। সে ধাইমাকে অনেক বুঝাল। সে বলল--"মা তুমি ঘরে চলে যাও। মিছামিছি কাঁদছ কেন ? আমরা ক্ষত্রিয়ের সন্তান। মৃত্যুকে ভয় পাই না। আমাদের রক্ত দিয়ে চান করে মা সুস্থ হলে আমাদেরও জীবন সার্থক হবে।" প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি কুমারদের মুখে এমন কথা শুনে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এবার জল্লাদের দিকে ফিরে কুমারেরা বলল--"জল্লাদ কলকরায়, একটু পরে তুমি আমাদের কেটো। তার আগে আমাদের একটু সময় দাও। আমরা আমাদের মাকে একটু ডেকে নেব। এ জন্মের মত তাকে দুটো মনের কথা বলে নেব।" এই বলে কুমারেরা পূর্বদিকে মুখ করে বলতে লাগল--"অ আমা, নুংলে আইয়াং মাহিংঅ থাংঅই তংখাদ ! চিনি দুখুন নুং নুদে নুকথা ছাইমাইয়া। নুং থুইফুরত চুংন নাইনা হিনয় আফান ছাইক্লাংঅ। তা কাইজাকদি হিনয়ক ছাইথাংমানি, বুক, নিনি ককলে আফা নারুগলিয়া--আফালেকাইথা। তাবুক তেকাইছা আমা-ন চিনি থুইবাইছে তুকুরোনা হিনয় চুংনছে তানানি রহখা। নুংলে বুক, থুইফুরু নছজ্লান ওয়াইছা ফান নাইফাইদিবা।"

অর্থঃ- মাগো, তুমি তো পরলোকে গিয়ে রয়েছ। আমাদের দুঃখ তুমি দেখছ কি দেখছনা জানি না। তুমি মৃত্যুকালে বাবাকে আমাদের দেখতে বলে গিয়েছিলে। 'বিয়ে করো না' বলেও গিয়েছিলে। তোমার কথাতো বাবা রাখেন নি--তিনি আবার বিয়ে করেছেন। বাবা এখন বিমাতাকে আমাদের রক্ত দিয়ে চান করানোর জন্য আমাদিগকে বধ করতে পাঠিয়েছেন। তুমি কোথায় আছ মা ? মৃত্যুর সময় তুমি একবার এসে তোমার ছেলেদের দেখে যাও।"

এই বলে কুমার দু'জন একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ঠিক সে সময় দেখতে দেখতে আকাশটা ঘন কাল মেঘে ছেয়ে গেল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, তার সাথে আছে কানফাটা মেঘের গর্জন। প্রচণ্ডভাবে চারদিক অন্ধকার করে ঝড় বইতে লাগল। আশপাশের গাছগুলো কড়মড় শব্দ করে ভেংগে পড়তে লাগল এদিক ওদিকে। রাণী নখাফিলিকের শ্মশানভূমি ছিল কাছেই। এক সময়ে প্রচণ্ড একটা মেঘ গর্জনের সাথে শ্মশান-ভূমিটা চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সাথে সাথে মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এল একরাশি কাল ধূয়া। একেই তো অন্ধকার, তার উপর মাটির নীচের ধূয়াগুলো অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলল। মাইলুমা ধাইমা কুমারদের বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। সংগে যারা এসেছিল প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও অন্যান্য লোকজনেরা খুব ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল, নিশ্চয়ই রাণী নখাফিলিক তার ছেলেদের নিয়ে যেতে এসেছেন। নইলে এ সময় এত ঝড় বৃষ্টি আসবে কেন ? কিছুক্ষণ আগেও তো আকাশটা বেশ পরিষ্কার ছিল। এ অবস্থায় এখানে থাকলে তাদেরও রক্ষা থাকবে না। তাই যে যার মত পালিয়ে গেল। শ্মশানে কেবল কুমার দু'টিকে নিয়ে জল্লাদ ও মাইলুমা ধাইমাই রয়ে গেল। জল্লাদ কলকরায় কি করবে কি না করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে খাঁড়া হাতে চুপ করে বসে রইল। ঝড় না থামলেতো কিছুই করা যাবে না। এমন সময় মাইলুমা ধাইমা তার ছেলেকে বলল--"বাবা কলক, কুমার দুজনকে বাঁচাতে হলে এই সুযোগ। তুই এদের বনে ছেড়ে দিয়ে আয়। বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন

আবার দেখা হবে। একথা তুই জানিস আর আমি জানি। আর কাউকে কখনও বলবি না। রাজার কানে একথা উঠলে দুজনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।'' ধাইমা কুমার দুটির মুখে শেষবারের মত চুমু খেয়ে কলকরায়ের হাতে তুলে দিল। যাওয়ার সময় ধাইমা কেঁদে কেঁদে বলে দিল--''বাবা, যে দিকে দুচোখ যায় সেদিকেই চলে যাও। বেঁচে থাকলে কোনদিন তোমাদের ধাইমাকে খোঁজ করো। বিপদে আপদে তোমাদের মা নথাফিলিকই তোমাদের দেখবেন।'' অন্ধকারের মধ্যে কুমার দুজনকে নিয়ে কলকরায় এগিয়ে গেল বনের দিকে। কিছুদূর নিয়ে গিয়ে কলকরায় কুমার দু'টিকে বনের পথে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল বধ্যভূমিতে। ঝড় বৃষ্টিতে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাণী হয়ত ওদিকে কুমারদের রক্তে চান করতে বসে আছেন।

জল্লাদ কলকরায় মায়ের কথামত একটা কুকুর কেটে রক্ত নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে ফিরে এল। ''এই নিন মহারাজ, কুমারদের রক্ত এনেছি।'' এই বলে কলকরায় রক্তের পাত্রটা মহারাজের সামনে রাখতেই মহারাজের অপত্য স্নেহ জেগে উঠল। তিনি কুমার কুতুং এবং কুচুং-এর নাম ধরে ডেকে ডেকে চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বার বারই তাঁর মনে হতে লাগল ছেলে দু'টির কচি মুখ। কিছুক্ষণ পর মহারাজ একটু সুস্থ হলে প্রধান অমাত্য তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগল--''মহারাজ কুমারদের জন্য আর শোক করে কি হবে ! যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন রাণীমাকে বাঁচানো প্রয়োজন। তিনি বেঁচে থাকলে আপনার আরো সন্তানাদি হবে। অনেক বুঝানোর পর রাজা খানিকটা শান্ত হলেন। এদিকে মাইলুমা ধাই রক্তের পাত্র নিয়ে এসেছে। রাণীকে চান করাতে হবে। দাসদাসীরা সবাই রাণীকে ধরাধরি করে এনে পিড়িতে বসাল। কি আশ্চর্য, ছেলেদের রক্ত দিয়ে চান করনো মাত্রই তার রোগপীড়া যেন মুহূর্ত্তে সেরে গেল। রাণী আবার আগের অবস্থা ফিরে পেল। রাণীর সুস্থতার কথা মহারাজের কানেও গেল। মহারাজ খুব খুশী হলেন।

রাত্তিরে মহারাজ রাণীর শয়ন কক্ষে গিয়েও কুমারদের জন্য শোক করতে লাগলেন। দুষ্টা রাণীও মহারাজের দুঃখে কপট সমবেদনা দেখাতে লাগল। রাণী বলতে লাগল-- "মহারাজ এ যাত্রা আপনার দয়ায় বেঁচে উঠেছি সত্যি। কিন্তু আমার বাঁচার চেয়ে মরাই ছিল ভাল। চাঁদের মত কুমার দুটির প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণটা ফিরে পেয়েছি-- এই যা। মহারাজ রাণীর ছলনা বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি তখন উল্টা রাণীকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। মহারাজ বললেন-- "তুমি দুঃখ করো না। তুমি বেঁচে থাকলে আমার এরকম আরও সন্তান হবে।" রাজার সান্ত্বনা বাক্য শুনে রাণী একটু মুচকি হাসলেন।

প্রধান অমাত্য সেনাপতি কিতিংরায় এবং অন্যান্য পারিষদবর্গ রাণীর সুস্থতার জন্য রাজা নিজ পুত্রকেও বধ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হল। এদিকে দিয়ারীকেও আর খোঁজ করে পাওয়া গেল না বলে তার প্রতি একটা ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠল। তারা সবাই ভাবল, এ দিয়ারী নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ না হয়ে যায় না। নয়ত তাকে এত খুঁজেও পাওয়া গেল না কেন ? আসলে কিন্তু দিয়ারীটিই হচ্ছে রাণীর প্রেমিক ফটিকরায়। রাজা রাজধানীতে ফিরে এলে পর ফটিকরায় একদিন গোপনে রাণীর সাথে পরামর্শ করে দিয়ারী সেজে এসে কুমারদের রক্ত দিয়ে রাণীকে চান করানোর বিধান দিয়েই পালিয়ে যায়। আবার রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে অন্দর মহলের সিন্দুকে ঢুকে পড়ে। দিয়ারী বেশধারী ফটিকরায়ের চালাকির কথা একমাত্র রাণী ছাড়া রাজবাড়ীর আর কেউ জানতে পারল না।

এদিকে কলকরায় যখন কুমারদের বনের পথে ছেড়ে দিয়ে এল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে সারা বন ঢেকে আছে। কুমারদের জংগলের পথে ছেড়ে দিয়ে আসতে এমন জল্লাদ তারও মনটা কেঁদে উঠল। কিন্তু কি করবে। এছাড়াতো আর অন্য উপায়ও নেই।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিক থেকে বাঘ ভাল্লুকের বিকট আওয়াজ থেকে থেকে কানে আসছে। কুমারেরা এ অবস্থায় কি করবে কি না করবে ভেবে কিছুই পাচ্ছিল না। রাজার জল্লাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েও বনের জীব জানোয়ারের হাতে প্রাণ যেতে বসেছে। বড় কুতুং তখন কুচুংকে বলছে--"দেখ ভাই, আজ আমরা মায়ের দয়াতে জীবন পেয়েছি। নয়তো দক্ষিণের শ্মশানে আমরা মাকে কেঁদে কেঁদে ডাকতেই এমন ঝড় বৃষ্টি এল কেন ? আর মায়ের শ্মশান থেকেইবা চারদিক অন্ধকার করে এমন ধূয়া উঠল কেন ? নিশ্চয়ই মা আমাদের ডাক শুনছেন। চল, আবার আমরা ডেকে তাঁকেই বলি। এবারও তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।" তাই দু'ভাই আবার ডেকে ডেকে বলতে লাগল--"মাগো, তুমি আমাদের জল্লাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। জল্লাদ এনে আমাদের বনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। চারদিক থেকে বাঘ ভাল্লুকের ডাক শুনছি। যে কোন সময় আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তুমি এসে আবার আমাদের রক্ষা করো।" একথা বলেই কুমার দু'জন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ঝড় তুফান থেমে গেছে অনেক আগেই। এরমধ্যে কুমার দু'জন দূরেই একজন মানুষের ছায়া দেখতে পেল। ছায়াটি যেন ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওর পিছনে পিছনে যেতে বলছে। চোখ মুছে বড় রাজকুমার কুতুং কয়েকবার ভাল করে দেখে নিল। নাঃ--সত্যিই একটি ছায়া যেন তাদেরই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক সময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত কুমার দু'জন ছায়ার অনুসরণ করতে লাগল। অন্ধকারেই পথ চলতে চলতে কিছু দূরে এগিয়ে গেল ওরা। আরও খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই ছায়াটা এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। কুমার দু'জনও যেখান থেকে ছায়াটা অদৃশ্য হল সে জায়গাটা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। জায়গাটা বেশ সুরক্ষিত, মস্ত একটা গাছের গায়ে বিরাটাকৃতি একটা গর্ত্ত। যাইহোক, রাজকুমারেরা সে রাত্রির মত সেখানে রয়ে গেল। সারাদিনের ক্লান্তিতে এক সময় অবসন্ন কুমারেরা ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনও বেশ কিছুটা রাত রয়েছে। কুমারদের কে যেন ডাকছে ঘুম থেকে উঠতে। কুমারেরা ঘুম থেকে উঠতেই গত সন্ধ্যার সব কিছু ঘটনা

মনে পড়ে গেল। ভয়ে আতঙ্কে গাঁটা শিউরে উঠল দু'জনেরই নাঃ--, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়। এখানে থাকলে কেউ নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে এবং খবরটা রাজার কানে পৌঁছতেও দেরী হবে না। তাই কুমার দু'জন গাছের গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে বনের পথ ধরে হাঁটতে লাগল। যতই ওরা এগুচ্ছে ততই বন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। এতক্ষণ বেলা পর্যন্ত হেঁটেও পথে একজন লোকেরও দেখা পেল না ওরা। বেশ বেলা হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে কুমারদের পা ছড়ে গেছে। সারা শরীর অবসন্ন আর পথ চলতে পারছে না। রাজার ছেলে, কষ্ট কাকে বলে এদ্দিন জানেনি। এতটা পথ হেঁটেও ওদের অভ্যাস নেই। এক সময় কুমার কুতুং একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। তেষ্টায় ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে। সে তার দাদাকে বলল--"আর যে চলতে পারছি না দাদা; ভারী তেষ্টা পেয়েছে। তাড়াতাড়ি একটু জল এনে দাও।" বড় কুমার কুতুংএরও একই অবস্থা। তবু সে ছোট ভাই কুতুংএর অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারল না। সে বলল--"তুই এখানে একটু বসে থাক। আমি এক্ষুণি জল নিয়ে আসছি। দেখবি আমি না এলে কিন্তু কোথাও যাবি না।" কুতুং জলের জন্য জঙ্গলের পথে এগুতে লাগল। খানিকটা দূর এগোতেই কুতুং একটা চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে পড়ল। কোন্ পথে সে এগুবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। যা হয় হবে, এই ভেবে সে উত্তর দিকের পথেই চলতে লাগল। কিছুটা পথ এগুতেই কুতুং কতগুলো মিস কালো পাহাড়ী লোক লাঠি হাতে বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখল। মনে মনে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। কি জানি বাপু, এরা হয়ত রাজার লোকই হবে। রাজা খবর পেয়ে আমাদের ধরে নিতে পাঠিয়েছেন। কুমার একথা ভাবছে আর আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। লোকগুলো কুমারের সুন্দর পোষাক ও দেবতার মত চেহারা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল--"তোমার বাড়ী কোথায় বাবা! এ বনে বাঘ ভাল্লুকের খুব ভয়। একা একা ঘুরছ কেন? যে কোন সময় যে কোন বিপদ হতে পারে।" কুতুং কেঁদে কেঁদে ওদের সব কথা জানাল। কুতুং এর কথা শুনে ওদের সবারই মনে খুব দয়া হল। ওদের দলেরই একজন এগিয়ে কুতুংকে বলল--"দেখ বাবা, এ বনে বাঘ ভাল্লুকের সাংঘাতিক ভয়

। আমরা পাহাড়ী লোকেরাও লাঠি, সড়কি ছাড়া একা একা ঘুরে বেড়াতে সাহস পাই না। তুমি তো নেহাৎ শিশু। তোমার ভাই কোথায় আছে ? আমাদের ওর কাছে নিয়ে চল। আমাদের কাছে "ভিলক" (পাহাড়ী লোকরা লাউয়ের যে শুকনো খোলে জল বয়ে নিয়ে যায় তাকে "ভিলক" বলে) ভরা ঠাণ্ডা জল আছে--ওকে খাওয়াব।" কুতুং যে পথে গিয়েছিল ওদের সংগে নিয়ে সে পথেই কুচুংকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কুচুং সেখানে নেই। কুচুংকে সেখানে দেখতে না পেয়ে কুতুং জোরে জোরে তাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোথায় কুচুং ! বন থেকে বনে শুধু কুতুং এর ডাকটাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। কুচুংএর উত্তর আর ফিরে এল না। ভাইয়ের শোকে কুতুং চীৎকার দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল --"নিশ্চয়ই ভাইকে বাঘে খেয়েছে। নয়ত এখান থেকেতো তার কোথাও যাওয়ার কথা নয়। উত্তর দিচ্ছে না কেন ! মাইলুমা ধাইমা ও কলকরায়ের দয়ায় আমরা দু'জনেই বেঁচেছিলাম। কিন্তু এবার ভাইটি আমার বাঘের মুখে প্রাণ দিল।" সংগের পাহাড়ী লোকগুলো অনেক করে কুমার কুতুংকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ওরাও এদিকে ওদিকে প্রচুর খুঁজে পেতে দেখল। কিন্তু কোথাও কুচুং এর কিছুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেল না। অগত্যা লোকগুলো কুতুংকে বলল--"বাবা কুমার বেলাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তোমার কুচুং নিশ্চয়ই কারো সাথে গিয়ে কোন পাহাড়ী পাড়াতে ঠাঁই নিয়েছে। বেঁচে থাকলে তাকে ঠিকই আমরা খুঁজে বের করব। তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। তুমি আমাদের সাথেই চল। জনপ্রাণী শূন্য এ গভীর বনে তুমি কোথায় যাবে ! তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত কুতুংকে ওরা লাংগা থেকে দু'টো "মাইদুল" (ভাত মোচার মত কিংবা গোল করে পাকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে 'মাইদুল' তৈরী করা হয়। এগুলো বেশ কিছুদিন অবিকৃত থাকে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ক্ষুধা পেলে পথিকেরা এগুলো খেত।) এবং খানিকটা জল বের করে দিল। এগুলো খেয়ে কুতুং প্রাণ ফিরে পেল। সারাদিনের ক্লান্ত কুতুং, হাঁটার শক্তি একদম নেই তাই পাহাড়ীয়াদের দলেরই

একজন তাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলল। কুমারকে নিয়ে পাহাড়ী লোকগুলো আবার বন পথে নিজেদের পাড়ার দিকে এগুতে লাগল। যেতে যেতে কুতুং ভাইয়ের দুঃখে খুব কাঁদতে লাগল। কারো কোন কথাই ওর মনকে শান্ত করতে পারল না। এদ্দিনে--এত কষ্টের পর আজ কুতুং এবং কুচুং, কুমার দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হল।

কুমার কুতুংতো ভাই কুচুংকে গাছের নীচে ছায়ায় বসিয়ে জল আনতে গেছে। ওদিকে সে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ছোট কুমার কুচুং তেষ্টায় থাকতে না পেরে দাদা যে পথে জল আনতে গেছে সে পথ ধরেই এগুতে লাগল। কিছুটা হাঁটতেই সে চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল। এবার কোন্ পথে যাবে সে। দাদা কোন পথে গেছে ? কোন কিছুই না ভেবে সে দক্ষিণের পথ ধরে চলতে লাগল। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কুমার খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার উপর আবার নির্জন বনপথ--মানুষের গতাগম্য একদম নেই। খুব ভয় করতে লাগল কুমারের একা একা পথ চলতে। সে কাঁদছে আর 'দাদা--দাদা' বলে চীৎকার দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে। রাজার ছেলে কচি শিশু। শক্তিইবা কতটুকু রাখে ! হোঁচট খাচ্ছে বার বার আর হয়ত খুব বেশী চলতে পারবে না। বাতাসে বনের শুকনো পাতাগুলো নড়ে উঠার শব্দ শুনলেই কুচুং থমকে দাঁড়ায়। চীৎকার দিয়ে ডাকতে থাকে তার দাদাকে। ওই বুঝি তার দাদা জল নিয়ে এল ! খানিক দেখেই আবার চলতে থাকে এমন সময় বিপরীত দিক থেকে দূর পাহাড়ী গাঁয়ের দু'জন লোক সে পথ দিয়ে আসছিল। গভীর নির্জ্জন বনে ওরা শিশুর করুন কান্না শুনে তাড়াতাড়ি ওদিকে এগিয়ে এল। কুমার কুচুং দু'জন লোককে তার দিকে আসতে দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হল। লোকদুটো বেশ স্বাস্থ্যবান। হাতে বাঁশের মোটা লাঠি, মাথায় পাগরী। লোক দু'জন কুমারের কাছে এসে অবাক হয়ে গেল। আহা, কি সুন্দর ছেলেটি; ঠিক যেন দেবপুত্র। কাদের ছেলে জানি ! কেমন করে গভীর বনে এল কে জানে ! আমাদের পাহাড়ে তো এমন সুন্দর ছেলে দেখা যায় না। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। পাহাড়ী লোক দু'জন এসে কুমারকে

কোলে তুলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কথার মধ্য দিয়ে লোক দু'জন জানতে পারল ওর নাম কুচুং রায়, বাবার নাম রাজা ফান কারাক। কুচুং রাজার ছেলে জেনে লোক দু'জন আশ্চর্য হয়ে গেল। কুমারের মুখে ভাঙা ভাঙা কথায় ওদের দুঃখের কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল। এক সময় কুচুং নিজের ক্ষুধা তেষ্টার কথা ওদের জানালে ওরা জলভরা 'তিলকটা' ওর দিকে এগিয়ে দিতেই এক নিশ্বাসে সবটা জল খেয়ে ফেলল। জল খেয়ে কুচুং প্রাণটা যেন ফিরে পেল। কাল রাত থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। তারপর আছে দারুণ হৈ হুজ্জুত, পথের ক্লান্তি। সারাটা গা ছড়ে-ছুলে গেছে। এসব দেখে পাহাড়ী লোক দু'জনের মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলল--"শোন বগলা, দেখে মনে হচ্ছে কুমারের খুবই ক্ষিদে পেয়েছে। অথচ আমাদের সাথে একটুও খাবার নেই। কাজেই ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কোন পাড়াতে যাওয়া প্রয়োজন। কুমার এক পা-ও হাঁটতে পারবে না। তুই ওকে তোর পিঠে ঝুলিয়ে নে।" বগলাও সর্দ্দারের কথামতো কুমারকে পিঠে ঝুলিয়ে নিল। ওরা কুমারকে দাদার জন্য কাঁদতে নিষেধ করল। তার দাদা নিশ্চয়ই কোন পাহাড়ী বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। পরে তাকে খুঁজে পেতে বের করা যাবে। চান নেই, খাওয়া নেই কুমার বগলার পিঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ হেঁটেছে ওরা। দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। পথের পাশেই একটা পাহাড়ী পাড়া পাওয়া গেল। কুমারকে নিয়ে ওরা পাড়াতে গিয়ে কিছু 'আওয়ান বাঙ্গই' (এক ধরণের পিঠা, যা পাহাড়ী লোকেরা এক প্রকার পাতায় চাল মুড়িয়ে সিদ্ধ করে তৈরী করে) চেয়ে নিয়ে কুমারকে খাওয়াল। এবার তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফেরা দরকার। খাইয়ে দাইয়ে অনেকটা সুস্থ করে কুমারকে পিঠে নিয়েই আবার ওরা গাঁয়ের দিকে রওনা দিল। পথে চলতে চলতে একসময় কুমারের মাইলুমা ধাইমার কথা মনে পড়তেই চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। সর্দার ও বগলা ওকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করল।

প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি বগলা ও সর্দার কুমারকে নিয়ে ওদের পাড়াতে পৌঁছল। সর্দারের হাতে কুমারকে দিয়ে বগলা নিজের পাড়াতে চলে

গেল। সর্দার কুমারকে নঙলে (বারান্দায়) বসিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে ডেকে বলতে লাগল--"অ তুইনাং দাতি নাইফাইদিবা। বলং লামানি খরকছা রাংচাকবুদুল তুব্ফাইলাহা। নিনি তালিখাকাহামনি বাগয়ছে রাংচাকব বুদুল নিনি ন-গ ছকফাইখা ব্লা। অ তুইনাং নাইফাইদিবা। (অর্থ ঃ ওগো তুইনা, তাড়াতাড়ি দেখতে এস। বনের পথে আমি একটি সোনার টুকরা কুড়িয়ে এনেছি। তোমার অদৃষ্ট ভাল বলেই না সোনার টুকরো ঘরে এসেছে। কোথায়গো তুইনাং, তাড়াতাড়ি এস না।)

স্বামীর ডাক শুনেই তুইনাং তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তুইনাংতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই কুলাং সর্দার কুমার কুচুংকে তুইনাংতির কোলে তুলে দিল। কুমারকে কোলে নিয়েই তুইনাংতির সে কি আনন্দ ! এমন চাঁদের মত একটি ফুটফুটে ছেলেকে কোথায় কিভাবে পেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা তুইনাংতি স্বামী কুলাং সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল। তুইনাংতি এবং কুলাং সর্দারের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। তাই ওদের মনে খুব আক্ষেপ ছিল। আজ কুচুংকে বুকে পেয়ে তুইনাংতির সে আক্ষেপ দূর হল। কুলাং সর্দার ছিল তার গাঁয়ের সর্দার বা প্রধান। গাঁয়ের সবাই তাকে মেনে-গণে চলত। গাঁয়ের আর পাঁচজনের চাইতে তার অবস্থাও ছিল যথেষ্ট ভাল। তুইনাংতির পরিশ্রম ও চেষ্টায় তার সংসারে লক্ষ্মী বাঁধা ছিল। সারাদিন কেঁদে কেঁদে কুচুং এর চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল। বনের পথে এলোপাথারি হাঁটতে গিয়ে হাত পা-ও অনেক জায়গায় ছড়ে-ছুলে গিয়েছিলো। তুইনাংতি তাড়াতাড়ি জল এনে কুমারকে ধুইয়ে মুছিয়ে খেতে দিল। খাওয়া শেষ হলে 'দাংদাল' (কাপড় রাখার আলনা) থেকে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় নামিয়ে বিছানা করে দিতেই সেদিনকার মত পরিশ্রান্ত কুমার ঘুমিয়ে পড়ল। সেদিন থেকে কুমার কুচুং কুলাং সর্দারের ঘরেই রয়ে গেল। সে তুইনাংতিকে মা এবং কুলাং সর্দারকে বাবা বলে ডাকে। সর্দার ও তুইনাংতি কুমারকে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসে।

এদিকে কুমার কুতুংকে যারা নিয়ে যাচ্ছিল সে দলটা সারাটা বিকেল চড়াই উৎরাই হেঁটে সন্ধ্যার একটু পরে ওদের পাড়াতে গিয়ে পৌঁছল। এটা ছিল বাছালদের পাড়া। বাছালদের সর্দারের নাম খা-কলক সর্দার। আশে পাশের পাড়া সমেত তার পাড়াতে সর্দারের প্রভাব প্রতিপ্রত্তি ছিল ঠিক রাজার পরেই। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিচার আচার বা কোন সমস্যা সমাধান করতে হলে গাঁয়ের লোকেরা তার কাছেই নিয়ে যেত সকলের আগে। তাই বনের পথে কুমারকে পেয়ে ওরা প্রথমেই বাছাল সর্দার খা-কলকের বাড়ীতেই নিয়ে গেল। বাছাল সর্দার সমস্ত কিছু শুনে ছামলাকে সংগে সংগে 'গং' বাদ্য (আগের দিনে কোন কোন পাড়ার সর্দারগণ এ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত। বিপদ আপদে কিংবা জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সর্দার এ ধরনের বাদ্য বাজিয়ে সংকেত ধ্বনি দ্বারা পাড়ার সকলকে ডাকত। যখন যে অবস্থাতেই থাকত এ সংকেত ধ্বনি শোনামাত্রই পাড়ার শক্ত সমর্থ লোকেদের তাদের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সর্দারের দাওয়ায় এসে হাজির হতে হত।) বাজাবার আদেশ দিল। গাঁয়ের লোকেরা কিছুক্ষণ আগে যার যার জুম থেকে বাড়ী ফিরেছে। রান্না-বান্না করে কিছুক্ষণ বাদে খেয়ে ঘুমোবে। এমনি সময়ে গং বাদ্যের শব্দ শোনামাত্রই প্রত্যেকে যার যার লাঠি, সড়কি, তীর ধনুক হাতে নিয়ে সর্দারের বাড়ীর দাওয়ায় এসে জমায়েত হল। সবার চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা, সর্দার কেন তাদের ডেকেছেন ? এখন তাদের কি করতে হবে ?

পাড়ার সব লোকেরা এসে গেলে এক সময়ে সর্দার কুমার কুতুং এর হাত ধরে এসে সভার মধ্যে দাঁড়াল। কুমারকে উঁচু জায়গায় বসিয়ে সর্দার উপস্থিত গাঁয়ের লোকদের বলতে লাগল--"আজ মহারাজ ফান কারাকের পুত্র কুমার কুতংরায় বিপদে পড়ে আমাদের পাড়ায় এসেছেন। তিনি আমাদের অতিথি। তাকে আমাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে হবে। তাঁর ছোট ভাই কুমার কুচুংরায় বনের পথে কোথায় হারিয়ে গেছে। তাঁকে যে করেই হোক তোমরা খুঁজে আনবে। কিন্তু সাবধান, তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে

দিচ্ছি। তোমরা কুমারের দুঃখের কাহিনী সব শুনেছ। মহারাজ যদি জানতে পারেন তবে কুমারকে ধরিয়ে নিয়ে বধ করবেন। আমাদেরও আস্ত রাখবেন না। তাই কুমার যে আমাদের এখানে আছে একথা কাউকে বলতে পারবে না। কারো মুখ থেকে এ সম্বন্ধে টু শব্দটি বেরুলেই তাকে আমি চরম শাস্তি দেব মনে রেখ। সবাই কুমারের দুঃখে গভীর সমবেদনা জানাল। সর্দারের সামনেই সবাই আগামীকাল থেকে কাজে লাগবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। যাওয়ার আগে সবাই কুমারকে প্রণাম করে সেদিনের মত বিদায় নিল। বাছাল সর্দার খা-কলক ও তার স্ত্রী সেদিন রাত্তিরে কুমারের দুর্ভগ্যের কথা নিয়ে আলোচনা করে সেদিনকার মত ঘুমিয়ে পড়ল।

বাছাল সর্দার খা-কলকের ছোট সংসার। স্বামী-স্ত্রী ও ছোট একটি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়েটির নাম মতম। তার সাংসারিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু সর্দারের স্ত্রীর মনে বড় আক্ষেপ--তার একটিও ছেলে নেই। যাহোক কুমারকে পেয়ে তার ছেলের অভাব মিটল। এদিকে রাত্তিরে কুমার কুতুং কুচুংকে স্বপ্নে দেখে কয়েকবারই কেঁদে কেঁদে উঠল। থেকে থেকেই মনে পড়তে লাগল মাইলুমা ধাইমার কথা। সর্দারের স্ত্রী ও সর্দার ঘুম থেকে উঠে উঠে কুমারকে শান্ত করল।

পরদিন কুলাং সর্দার খুব ভোরেই বগলাকে ডেকে আনাল। রাতটাতো ছোট কুমার কুচুংরায় কেঁদেই কাটিয়েছে। এখনও তার জের যায়নি। চোখ মুখ ফুলে রয়েছে। বগলা হল সর্দারের দক্ষিণ হাত। তাকে দিয়েই সর্দার যখন তখন ফুট ফরমাশ করিয়ে থাকে। তাই সেদিনও সর্দার বগলাকে দিয়েই গাঁয়ের সব লোকদের ডাকাল। বিকালের দিকে সর্দারের দাওয়ায় গাঁয়ের সব লোক জড় হলে সর্দার তাদের সবাইকে বলল--"দেখ এই যে কুমার ইনি হচ্ছেন আমাদের মহারাজা ফান কারাকের ছেলে। মন্দ অদৃষ্ট বলে রাজবাড়ীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে আমাদের মত গরীব প্রজার বাড়ীতে আজ অতিথি। একমাত্র বিধাতা পুরুষের দয়াতেই এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।" এই

বলে সর্দার ছোট কুমারের মুখ থেকে শুনে শুনে যতটুকু ধারণা করতে পেরেছে তাই গাঁয়ের লোকেদের বলে শোনাল। ''মহারাজ যদি জানতে পারেন যে ছোট কুমার বেঁচে আছে এবং আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে তবে কুমারকে আর বাঁচানো যাবে না। আমাদেরও বিপদের অন্ত থাকবে না। তাই কুমার কুচুংরায় যে আমাদের এখানে আছে একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সেদিন বিকালবেলা সর্দারের সামনেই সবাই প্রতিজ্ঞা করল কুমারের কথা ওরা কারো কাছে প্রকাশ করবে না !

কুলাং সর্দারের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। জুমে কাজ করে স্বামী স্ত্রী যে ফসল পেত তাতে দু'জনের সারা বছর গিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকত। স্বচ্ছল গৃহস্থ কুলাং সর্দারের সাংসারিক ব্যাপারে তাই কোন চিন্তাই ছিল না। স্বভাবের দিক দিয়েও সর্দার ছিল খুব আমোদে লোক। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর তার বাড়ীতে গান বাজনার আসর বসত। রেছম, ছুমুই, দাংদুল, মুরচঙ্গ, চম্প্রেং প্রভৃতি গান বাজনার যাবতীয় বাদ্য যন্ত্রই তার বাড়ীতে ছিল। কুলাং সর্দারের স্ত্রীও গান বাজনায় কারো চাইতে কোন অংশে কম যেত না। পাড়ার আর পাঁচজনও গান বাজনা করতে সর্দারের বাড়ীতে আসত। প্রত্যেকদিনই কুলাং সর্দারের ঘরে গানের আসর বসত। এরকম আসর বসলেই কুমার কুচুং গানের আসরের পাশে প্রায়ই বসে থাকত আর মনোযোগ দিয়ে শুনত। দিনের অন্যান্য সময় যখন বাদ্য যন্ত্রগুলো সাজান থাকত তখন কুমার তার পছন্দ মত এটি ওটি নিয়ে নাড়াচাড়া করত। এসব কোন কিছুই কুলাং সর্দারের চোখ এড়ায় না। সে দেখল কুমার কুচুং এর গান বাজনার দিকে খুব ঝোঁক। তাই সে মাঝে মাঝে কুমারকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তালিম দিতে লাগল। বগলাও এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ। কুলাং সর্দারের সাথে সাথে বগলাও কুমারকে বিভিন্ন গান বাজনা শেখাতে লাগল। গানই হোক কিংবা বাজনাই হোক খুবই তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিচ্ছে দেখে সর্দার ও বগলা দুজনেই অবাক হয়ে গেল। উপযুক্ত শিক্ষার্থী পেয়ে দু'জনেই খুব খুশী !

নিনাংতি--বগলার ছোট্ট মেয়ে। ফুটফুটে, সুন্দর কুমারের প্রায় সমবয়সী। সেও আসত বাবার হাত ধরে ধরে কুলাং সর্দারের ঘরে। সংগে সংগে বগলা তাকেও দাংদুল বাজনা শিখাতে লাগল। কুমার কুচুং আর বগলার মেয়ে নিনাংতির শিক্ষা চলতে লাগল পুরোদমে। দু'এক বছর যেতে না যেতেই কুমার আশেপাশের পাড়ার মধ্যে একজন নামজাদা গায়ক ও বাদক বলে পরিচিত হল। কুমারের গান বাজনার সুখ্যাতিতে সবাই পঞ্চমুখ।

এদিকে পরদিন ভোর বেলাতেই বাছাল সর্দার কেপেকছা, ছামলা প্রভৃতি কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিল ছোট কুমারের খোঁজে। বাছাল সর্দার খা-কলক নিজেও দু'একজন সংগী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গতকাল কুমার কুতুং ছোট ভাই কুচুংকে যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল প্রথমেই তার চারপাশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে নিল। বলাতো যায় না, বাঘ ভাল্লুকেও নিতে পারে। ভগবান না করুন, তাই যদি হয় অন্ততঃ ছোট কুমারের কাপড় চোপড়গুলোরও কিছু হদিস পাওয়া যাবে। বহু খুঁজেও বাছাল সর্দার ছোট কুমারের কিছুমাত্র চিহ্ন পেল না। অগত্যা আশপাশের দু'একটা পাড়াতে খোঁজ খবর নিয়ে দুপুরের শেষে খা-কলক সর্দার নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এল। এখন শুধু ছামলা, কেপেকছা ওদের সংবাদ পেতে বাকী রইল। সর্দার ও কুমার কুতুং দু'জনেই খুব উৎকন্ঠা নিয়ে ওদের অপেক্ষা করতে লাগল। কি জানি, ওরা হয়ত ভাল খবরও নিয়ে আসতে পারে। সারাদিন ছামলা ওদের দল দূরের প্রত্যেকটি পাড়াতে গিয়ে এক এক করে খোঁজ করল। কিন্তু পাওয়া তো দূরের কথা, কেউ কুমারকে দেখেছে বলেও জানাল না। কাজেই সন্ধ্যা নাগাদ ওরাও নৈরাশ্যজনক খবরই নিয়ে এল। এত করেও ভাইয়ের কোন খোঁজ না পেয়ে কুমার কুতুং কান্নায় ভেংগে পড়ল। কুচুংকে নিশ্চয়ই বাঘে খেয়েছে। নয়ত এত খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়া যাওয়ার কারণ থাকতে পারে না। সুখে-দুঃখে দু'ভাই এদ্দিন বড় হচ্ছিল। আজ বুঝি ভাইকে তার চিরদিনের মত হারাতে হল। গত দু'তিন দিনের স্মৃতি কুতুংকে আরও অস্থির করে তুলল। তার মনে পড়ে গেল কি করে জল্লাদের হাত থেকে

বেঁচেছে। মনে পড়ে মাইলুমা ধাইমা ও জল্লাদের স্নেহের কথা; তার মা, মৃতা মহারাণী কি করে অন্যান্যদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বাঁচিয়েছে। অন্ধকার রাত্রিতে বনের মধ্যে যখন ওরা কি করবে কি না করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না তখন সেই ছায়ামূর্ত্তিই (সম্ভবত তিনি তাদের মা-ই হবেন) পথ দেখিয়ে একটা গাছের গর্ত্তে নিয়ে গিয়ে বনের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছিল। হায়, এত করেও শেষ পর্যন্ত আজ ভাইকে হারাতে হল। একটানা অনেকক্ষণ কাঁদল কুতুংরায়। এক সময়ে কুমার কুতুং কেঁদে কেঁদে তার স্বর্গীয় মাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল--"মা এদ্দিন ছায়ার মত অলক্ষ্যে থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ। আজও হয়ত আড়ালে থেকে সব কিছুই দেখছ। কুচুং বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। সে যেখানেই থাকুক আজও তুমি তোমার অসহায় ছেলেদের রক্ষা করো।"

বাছাল সর্দ্দারের একমাত্র মেয়ে মতম, কুমার কুতুং এর সব সময়ের খেলার সাথী। এ ছাড়া অন্যান্য সংগী সাথীদের মধ্যে রয়েছে গাঁয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা। রাজার ছেলে বলে কুমারকে সবাই সমীহ করে চলে। সে-ই সমস্ত দলের প্রধান। উন্মুক্ত, উদ্দাম বন্য পরিবেশ। এদিকে ওদিকে জুম, জঙ্গল। কুমার ছোট ছোট ছেলের দল নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়--ছোট ছোট শিকার করে। সবাইকে নিয়ে মাংস রেঁধে খায়। মাঝে মাঝে ছোট ভাই কুচুং এর কথা মনে পড়লে বুকটা টনটন করে। আজ সে সাথে থাকলে কি মজাই না হত।

কোঁথা দিয়ে দেখতে দেখতে আট দশটা বছর চলে গেল। কুমার কুতুং এর এখন পুরোপুরি যৌবন কাল। শত হলেও রাজার ছেলেতো ! দেখতে শুনতে আর দশটা ছেলে ওর কাছে এগুতেই পারে না। যেমনি তার রূপ তেমনি তার শক্তি সাহস। দেখলে চোখ লেগে থাকে। শিকারে বেরুলেও কুমারের সাথে কেউ এঁটে উঠে না। অন্যদিকে মদ খেতে

বসলেও তার সাথে কেউ পেরে উঠে না। তার অব্যর্থ নিশানা থেকে কোন পশু পাখীরই পরিত্রাণ নেই।

আগের দিনে ত্রিপুরার প্রত্যেক শক্ত সমর্থ পুরুষকেই অস্ত্রবিদ্যা শিখতে হত। যুদ্ধের সময় রাজা তাদের তলব করতেন। কলকরায়ও ছিল একজন নিপুণ সেনাপতি। তার অধীনে অনেক সৈন্য সামন্ত থাকত। প্রয়োজন বোধে রাজা তাকেই ডেকে পাঠাত তার দলবল নিয়ে রাজধানীতে হাজির হতে। তাই কুমারকেও কলকরায় খুব ভাল করে বিভিন্ন রকম অস্ত্রবিদ্যা শেখাল। নিজে অস্ত্র বিদ্যা শিখে এবং বেশ কিছু পাহাড়ী যুবককে অস্ত্র বিদ্যা শিখিয়ে ভিতরে ভিতরে কুমার কুত্তং একটা ছোটখাট সৈন্যদলও গড়ে তুলল। নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে যদি কোনদিন এ সৈন্যদল প্রয়োজনে লাগে, এরকম একটা ক্ষীণ আশা তার মনে ছিল।

বাছাল সর্দ্দার খাঁ কলক কুমারকে খুবই স্নেহ করে। কুমার যা কিছুই করুক না কেন, তা ভালই হোক কিংবা মন্দই হোক বাছাল সর্দ্দার তাতে সমর্থন জানায়। সে কখনও কোন মন্দ কাজ করলেও তাকে বারণ করে না। সর্দারের নীরব সমর্থনে কুমার সব সময় প্রশ্রয়ই পেয়ে থাকে। একেতো রাজার ছেলে তার উপর সর্দারের ভয়ে গাঁয়ের লোকেরা কোন সময়েই কুমারকে কিছু বলে না। তাই প্রায় সময়ই কুমার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে--গাঁয়ের এ বাড়ী সে বাড়ীতে নানারকম অত্যাচার করে বেড়ায়। এরকম উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে কুমারের দিন যায়। যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে পাড়ার যুবতী মেয়েদেরও কাছে টেনে নেয় কুমার। কুমারের রূপ যৌবনের কাছে ওদের ধরা না দিয়ে উপায় থাকে না। এদের মধ্যে মতমকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে কুমার। কোন কোন অলস বিকালে কুমার মতমকে নিয়ে চলে যায় পাড়া থেকে দূরে টিলার উপর কোন নির্জন জায়গায়। সেখানে ওদের প্রাণ খোলা কত কথাই হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কুমার মতমকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে--"মতম, কোনদিন যদি রাজা হতে পারি তবে তোমাকে আমি

রাণী করব।তোমাকে নিয়ে হবে আমার সুখের সংসার।'' পাহাড়ী সর্দ্দারের মেয়ে মতম।রাণী হলে দাসদাসীদের পরিচর্যা, রাজবাড়ীর ভোগ ঐশ্বর্য কিছুই কল্পনায় আনতে পারে না। তার কল্পনা তার দৃষ্টিকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। অজানা পুলকে তার মন নেচে উঠে। বাছাল সর্দার এবং তার স্ত্রীও চায় কুমার মতমকে বিয়ে করুক। কেননা, শিশুকাল থেকে ওরা খুব কাছাকাছি থেকে বড় হয়েছে। তাই দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে।

এদিকে কুমার কুচুং সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। ষোল সতেরো হবে বয়েস। বগলার মেয়ে নিনাং এরও তার কাছাকাছিই হবে। প্রায় কুচুং এর সমবয়সি। দুজনে খুব ভাব। কুমার কুচুং যখন চম্প্রেং বাজিয়ে সুর ধরে নিনাং তার পাশেই দাংদুল নিয়ে বসে। গানের সুরে সুরে দু'জনেই বিভোর হয়ে যায়--বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কুচুং এর ভিতরে রয়েছে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি। সে সহজেই খুব সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে এবং তার সুর দেয়। সে সব গানের রচনা যেমনি সুন্দর সুরও তেমনি মন মাতানো। শুনলেই প্রাণ মন কেড়ে নিতে চায়। শিশুকালের অনেক কথাই কুচুং এর মনে আছে। মা নখাফিলিকের কথা, বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা, বিমাতার রোগমুক্তির জন্য কুমারদের জল্লাদের হাতে সঁপে দেওয়া, মাইলুমা ধাইমা এবং জল্লাদের দয়ায় কি করে ওরা দু'ভাই বেঁচেছে এবং শেষ পর্যন্ত বনের মধ্যে কি করে দু'ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হল সবই কুমারের মনে রয়েছে। নিজের জীবনের সে সব কথা জুড়ে জুড়ে এক সুন্দর গান রচনা করে কুমার সুর দিয়েছে। সে করুন কাহিনী শুনলেই চোখে জল আসে। আজকাল গানে বাজনায় সারা পাহাড় অঞ্চলে কুমারের জুড়ি নেই। অনেক দূর দূর জায়গা থেকেও কুমারের গান শুনতে লোক ছুটে আসে। দিন দিন কুমারের গানের শ্রোতা সংখ্যা বেড়ে চলল। সাথে সাথে দূর দূর পাড়া থেকে গান শুনানোর নিমন্ত্রণও আসতে লাগল। কিন্তু কুমার নিনাংভিকে বাদ দিয়ে কোথাও যেতে নারাজ। সে-ই তো তার প্রেরণার উৎস। বাজাবে কে ? দাংদুল ছাড়া যে গান মোটেই জমে না। এদিকে নিনাংভিকে সংগে নিয়ে যেতেও

অনেক অসুবিধা। সে 'সিক্রা' মেয়ে (অবিবাহিত যুবতী)। এ অবস্থায় তার মা বাবাও কুমারের সংগে অন্য পাড়ায় যেতে দেবে কেন! কুমার আর নিনাং এর মধ্যে যখন এতই ভাব তখন তুইনাংতিও চাইছিল ওদের দু'জনের যেন বিয়ে হয়। ওদের বিয়ে হলে ওরা পরস্পর সুখীই হবে। তাই কুমারের এবং সর্দারের মনোভাব জেনে বগলার নিকট তুইনাংতিই প্রথম প্রস্তাবটি দিল। নিনাং এর বাবা বগলা যেন হাতে চাঁদ পেল। তারও তার স্ত্রীর খুশীর সীমা নেই। আসছে ফাল্গুনেই বিয়ে ঠিক হল। নিনাং এর সাথে বিয়ে হবে জেনে কুমারও খুব খুশী--নিনাং তার যোগ্য স্ত্রীই হবে। কখনও কুমার গাইবে নিনাং বাজাবে, আবার কখনও নিনাং গাইবে কুমার বাজাবে। গানে গানে ওদের জীবন ভরে উঠবে।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকেই এক শুভ দিনে খুব ধুমধাম করে নিনাং এর সাথে কুমারের বিয়ে হয়ে গেল। প্রচুর ভোজনও হল। নিনাং এবং কুমার উভয়েই খুব খুশী। তুইনাংতিও নিনাংকে বৌ করে ঘরে তুলতে পেরে খুব খুশী। পাড়ার আর পাঁচজনেরও আনন্দের শেষ নেই। এবার নিনাংকে নিয়ে গানের দল গড়তে আর কোন আপত্তি রইল না। এদ্দিন প্রস্তাব মনে মনেই ছিল কুমারের। একদিন কুমার গানের দল গড়বে বলে কুলাং সর্দারের কাছে প্রস্তাবটা দিতেই কুলাং সর্দারও আনন্দের সাথে সাথেই সম্মতি জানাল। দল গড়া হল একটা। এ দলে রইল, নিনাং, কুলাং সর্দ্দার, বগলা এবং তার গাঁয়ের আরও পাঁচ ছ'জন ভাল গাইয়ে বাজিয়ে। এবার কুমারের বেরিয়ে পড়ার পালা। সে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গান শুনাবে --যে গানে তার নিজের জীবনের করুন কাহিনী গাঁথা থাকবে। আর থাকবে পাহাড় জীবনের সুখ দুঃখের কথা।

গানের দল গড়ার পেছনে কুমারের দু'টো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ গানের দল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গাইলে, হয়ত কোন এক পাড়াতে তার ভাই কুতুং এর খোঁজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তাই ভাই যদি কখনও এ

গান শুনে তবে নিশ্চয়ই লুকিয়ে থাকবে না। দ্বিতীয়ত, তার স্বরচিত করুন গানের কলিগুলো মানুষকে খুব কাঁদায়। মানুষ কেঁদে কেঁদেও এগুলো আরও বেশী করে শুনতে চায়। তাই বিভিন্ন পাড়া থেকে আসছিল প্রচুর আমন্ত্রণ। মানুষ এগুলো শুনবে, আনন্দ পাবে এবং সাথে সাথে পাহাড় অঞ্চলে গান বাজনার প্রচলনও আরও বেশী হবে এও একটা উদ্দেশ্য ছিল তার।

প্রথম প্রথম কুমার কুচুং ধারে কাছের যে সব পাড়া থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল সে সব পাড়াতে গেল। যে পাড়াতেই কুমার দু'একদিনের জন্য যায় সেখানেই তাকে চার পাঁচদিন থাকতে হয়। পাড়ার লোকেরা তার দলকে ছাড়তে চায় না।এত শুনেও যেন ওদের আশা মেটে না। শেষ পর্যন্ত কুমারকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'আবার আসব' বলে ছুটে আসতে হয়। এভাবে একের পর এক পাড়াতে ঘুরে ঘুরে কুমার গেয়ে চলল। সাথে সাথে কুমার দাদা কুতুং এরও খোঁজ করতে লাগল। আশেপাশের পাড়াগুলোতে গাওয়া শেষ হলে কুমার দূরের পাড়াগুলোতে যাওয়া শুরু করল। এদিকে কুমার কুচুং এর অদ্ভুত গানের কথা সারা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে এ খবরটা বাছাল সর্দার খা-কলকের পাড়াতেও গিয়ে পৌছল। ছামলা ওরা সবাই মিলে এসে বাছাল সর্দার খা-কলককে ধরে বসল--যে করেই হোক এ গানের দলটাকে পাড়াতে এনে গান শুনতেই হবে। সর্দারের মেয়ে মতম ও ছামলা ওদের সাথে বাবাকে অনুরোধ জানাল। সবাই যখন ধরেছে সর্দার কি আর করে ! সানন্দে তাদের প্রস্তাবে সায় দিল। পরদিন সর্দার ছামলা, কেপকছা, ছদুরায় ওদের পাঠিয়ে দিল গানের দলটাকে পাড়ায় নিয়ে আসতে।

গানের দিন। সর্দারের বাড়ীতেই গানের আসর বসল। প্রচুর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কুমার কুতুং বন থেকে কয়েকটা 'মুছই' (এক জাতীয় হরিণ) মেরে এনেছে। যে কয়দিন গান চলবে সে কয়দিন পাড়ার সবাই সর্দারের বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করবে। কাজেই আয়োজনও সে ভাবেই করতে হয়েছে।

সন্ধ্যা নাগাদ গান শুরু হল। কুচুং চম্প্রেং, নিনাং নিয়েছে দাংদুল, সর্দারের হাতে রেছম, আর বগলা নিয়েছে ছুমুই (বাঁশী)। সর্দারের দাওয়ায় সেদিন লোকে গিজগিজ করছে। কুমার কুতুং আর মতমও সুবিধামত একটা জায়গা নিয়ে বসেছে। বাজনার তালে সকলেরই মন আবেগে ভরে উঠল। এক সময় কুচুং গান ধরল--

"চেরাইফুরু আমালে থুইমা,
আফা বুবাগ্রা চুংন মুরুগয় নারুকথা;
বরক কুবুনরগনি কক খ্নাঅই আফা তেওয়াইছা কাইখা।
মা মাতৈনি হামিয়া অংমানিলে--
অযাদু, থুইছে বিথি অংখা--
আ থুইনি বাগয় চুং তাখুগনুই-ন তাননানিছে ছিমালুংঅ হরখা।
আফুরু চুং তাখুগণুই আমা-ন নুংহরই কা-ব।
তালিখা কাহামনি বাগয় ওয়াতুই-নবার ফাইমা বাইছে--
হা ক্লু অই রুখা--।
আমানি মাংখরনি হকু কখাং-কছম্ নগুই
যন্তন কিরিজাগয় খারখা।
তংমানিলে আমা দাইজুক বছাক্রাছে [illegible]জায়।
চিনি দাইজুক কাবতুতুই চুংন বলংঅ খারনা হরখা।"

অর্থ ঃ- শিশুকালে মা মারা গেলে বাবা আমাদের দেখেশুনে রাখছিলেন; অন্যের কথায় বাবা আবার বিয়ে করলেন। বিমাতার অসুখ করল, রক্ত হল তার ওষুধ। আমাদের দু'ভাইকে কেটে সে রক্ত সংগ্রহ করবার জন্য শ্মশানে জল্লাদের সাথে পাঠানো হল। সে সময় আমরা দু'ভাই মাকে ডেকে ডেকে খুব করে কাঁদতে লাগলাম। অদৃষ্ট ভাল বলে সে সময় ঝড় বৃষ্টির দাপটে পৃথিবী কেঁপে উঠল; মার শ্মশান থেকে কাল ধোঁয়া সমস্ত জায়গাটা ঢেকে ফেলল। তাই দেখে সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। থাকার মধ্যে রইল কেবল দু'জন--মাইলুমা ধাইমা আর তার ছেলে। আমাদের ধাইমাই কেঁদে কেঁদে বনের পথে আমাদের যেতে পাঠিয়ে দিল।

কুমার কুচুংএর গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিনাং গান ধরল--

"অ আতা, আতা, আনি আতা--
তুইনি বাগয় থাংমানিলে নুংবা বরছে থাংগয় তংখা।
আ-ন ছাইচুং লামাঅ খিবিঅয় ব-র থাঙ্গয় তংখা।
তাবুকব আছুক তরয় কাবন আতান মালাইলিয়া।
অ আতা, তাবুক ব নুংলে ব-র থাঙ্গয় তংখা ?"

অর্থ ঃ- ওগো দাদা, আমার দাদা, জল আনতে গিয়ে তুমি কোথায় রইলে ! আমাকে একা একা বনের পথে ফেলে দিয়ে তুমি কোথায় গিয়ে রইলে। এত বড় হয়েও আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি; কিন্তু তোমার দেখা আজও পেলাম না। ওগো দাদা, আজ অবধি তুমি কোথায় গিয়ে রয়েছ।"

গানের সুরে উপস্থিত সকলেরই চোখের জলে বান ডেকে গেল। কুমার এতক্ষণ ধরে গায়ক কুচুং এর দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছিল--কুচুং এর কথাই। কুচুং থাকলেও এদ্দিনে এত বড়টিই হত। গায়কের মুখের আদলটিও কুমারের নিকট খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তাকে এর আগে সে কোথায় যেন দেখেছে, এ কথাই কুমার এতক্ষণ ভাবছিল। গান শেষ হলে কুমারের আর কোন সন্দেহই রইল না। এদ্দিন বহু চেষ্টা করেও যার দেখা পাওয়া যায় নি, সেই প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইটি আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরই জীবনের করুণ কাহিনী মর্মভেদী সুরে গেয়ে গেয়ে তাকে শোনাচ্ছে। হায় অদৃষ্ট ! কুতুং আর স্থির থাকতে পারল না। কোনমতে রাস্তা করে দৌড়ে গিয়ে আসরের মধ্যেই কুচুংকে বুকে জড়িয়ে ধরল--তার চোখে জল। বহুদিন পর আবার ভাই ভাইকে ফিরে পেল। দু'জনের প্রাণেই আনন্দের বান ডেকে গেল।

এদিকে মতম ও নিনাং এর মধ্যেও খুব ভাব জমে গেছে। ওদের দু'জনেরও যেন কথার শেষ হতে চায় না। কথা বার্ত্তার মধ্য দিয়ে নিনাং

এর সাথে যে কুচুং এর বিয়ে হয়েছে এ কথা সে জানাল। হাসতে হাসতে এক সময় নিনাং কুতুং এর সাথে মতমের বিয়ে দেবার চেষ্টা করবে বলেও জানাল। ওদিকে খা-কলক সর্দার, কুলাং সর্দার, বগলা ওদেরও আজ আনন্দের দিন। ওরা বসে গেছে মদ নিয়ে ! ছামলাই ওদের ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। সংগে মাংসও আছে প্রচুর যে যত খেতে পারে।

যাহোক, খুব আনন্দের মধ্যেই রাতটা পোহাল। পরদিনই কুচুং খা-কলক সর্দারের নিকট মেয়ে মতমের সাথে কুতুং এর বিয়ের প্রস্তাব দিল। সর্দারও কুচুং এর প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি জানাল। ফাল্গুনের শেষের দিকে এক শুভ দিনে কুতুং এর সাথে মতমের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে দশ পাড়া দশ ঘরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল। প্রচুর আনন্দও হল।

কুতুং এর সাথে মতমের বিয়ের কয়েকদিন পর--একদিন বিকালে দু'ভাই বসে বসে গল্প করছে। এক সময় কুতুং কুচুংকে বলছে--"ভাই, বহু বছর পর আমরা দু'ভাইতো যাহোক মিলেছি। বাবার অবস্থা কিন্তু এখনও কিছু জানতে পারিনি। তিনি কেমন আছেন কে জানে ? যে বিমাতার জন্য আমাদের জল্লাদের হাতে দিয়েছিলেন সে মা-টিই বা কেমন আছে কে জানে ? তার ঘরে কোন ছেলে পিলে হয়েছে কিনা তাও জানি না। যাইহোক বা নাহোক আমরা বাবার বড় ছেলে। বাবার অবর্ত্তমানে সিংহাসনের দাবী আমাদেরই সকলের আগে। আমরা সে দাবী ছেড়ে দেব কেন ? বাবা এমনিতে না দিতে চানতো আমরা জোর করে আমাদের পাওনা আদায় করব। যে বিমাতা আমাদের মারতে চেয়েছিল তার ছেলেদের আমরা কিছুতেই খাতির করব না। কুচুংও দাদার কথায় সায় দিল। দু'ভাইয়ে মিলে পরামর্শ করে রাজধানীতে যাওয়াই ঠিক করল। তবে প্রথমেই সরাসরি ওরা রাজার সামনে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দেবে না। নিজেদের পরিচয় গোপন করে গানের দলের গায়ক হিসাবে প্রথম রাজবাড়ীতে যাবে। এবং গানের ছলে অতীত ইতিহাস রাজাকে গেয়ে শোনাবে। এতে নিশ্চয়ই রাজার পূর্ব কথা মনে হবে, ভাবান্তর হবে। অবস্থা বুঝে তখন পরিচয় দেওয়া হবে বলে স্থির হল।

পরামর্শ মত একদিন কুচুং তার দলবল নিয়ে রাজধানীর দিকে রওয়ানা হল। তার দলে রইল খা-কলক, কুলাং সর্দার, বগলা, ছামলা, মতম ও নিনাং এবং আরও দু'চারজন ! কয়েকদিন ক্রমাগত বনের পথ হেঁটে হেঁটে একদিন ওরা রাজধানীর উপকন্ঠে উপস্থিত হল। কিন্তু রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজাকে গান শোনাতে হলে প্রথমেই রাজার অনুমতি প্রয়োজন ! তাই দু'জন বুদ্ধি করে প্রথমেই খা-কলক ও কুলাং সর্দারকে পাঠিয়ে দিল রাজার অনুমতি সংগ্রহ করতে। সর্দার দু'জন রাজবাড়ীতে গিয়ে প্রধান অমাত্য কাচাক চৌধুরীর সংগে দেখা করে রাজদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করল। রাজ দর্শনের কারণ হিসাবে তারা এও বলল যে পাহাড় থেকে খুব ভাল একদল গায়ক গায়িকা এসেছে। তারা মহারাজকে নিজেদের গান শোনাতে চায়। এবং একারণেই সর্দার দু'জন মহারাজের সংগে দেখা করে অনুমতি প্রার্থনা করছে। গানের কথা শুনে কাচাগরায়ও খুব খুশী হল। তাই সে নিজে উৎসাহী হয়ে রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে মহারাজের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এল। পরদিনই রাজ দরবারে গান হবে বলে ঠিক হল। গানের সময় মহারাজও স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন বলে ওদের জানিয়ে দেওয়া হল। সর্দার দু'জন খুশী মনে ফিরে এসে দলের কাছে সংবাদ জানাল।

পরদিন যথা সময়ে রাজ দরবারে গানের আসর বসেছে। গায়ক-গায়িকা, বাদক প্রভৃতি সবাই আজ সেজেগুজে এসেছে। পাত্রমিত্র শ্রোতায় রাজদরবার গমগম করছে। এমন সময় মহারাজা এসে দরবারে প্রবেশ করলে সবাই দাঁড়িয়ে মহারাজকে নমস্কার জানাল। মহারাজ সিংহাসনে বসলে কুচুং প্রথমেই মহারাজাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। দলের অন্যান্যরা যার যার যন্ত্র নিয়ে বাজাতে সুরু করল। অনেকদিন পর মহারাজকে দেখে কুতুং এবং কুচুং এর দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। এই তো ওদের সেই স্নেহময় পিতা যিনি বিমাতার দুষ্ট বুদ্ধিতে ভুলে ওদের বধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কুচুং অতি কষ্টে চোখের জল সামলে প্রথমেই রাজবংশের প্রশস্তিমূলক একটি গান ধরল। এতে রয়েছে চন্দ্র বংশের বিভিন্ন রাজাদের গুণকীর্তির অমর কাহিনী। প্রজা হিতৈষণার কাহিনী আর বড় বড় যুদ্ধের

কথা। সে কি গান ! গানের সুরে ছোট বড় সকলের মন প্রাণ মাতিয়ে তুলল। তার উপর আছে কুচুং, কুতুং, নিনাং, মতমের অপরূপ সৌন্দর্যের আবেদন। যে একবার ওদের দিকে চাইছে সে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। পাহাড়ী লোকদের মধ্যে এত সুন্দরও হতে পারে। এক ফাঁকে মহারাজ প্রধান অমাত্যকে ডেকে বলল--"কাচাক চৌধুরী, পাহাড়ীদের মধ্যে এত সুন্দর লোকতো আগে কখনও দেখিনি। গানের শেষে তুমি ওদের পরিচয় জেনে নিও।" -- "যে আজ্ঞে, ধর্মাবতার," বলে মন্ত্রী তখনকার মত চুপ করে রইল।

কুচুং এবার বর্ত্তমান মহারাজের অতীত কথা কিছু কিছু গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে গাইতে শুরু করল। সাথে সাথে ওদের ছোটাবেলার করুণ কাহিনীও যোগ করল।

" অ খ্নানাইরগ, খ্নাদি জত্তন খ্নাদি;
বুবাগ্রানি বছাজ্লা কুনই তংমানি--
বুবাগ্রানি বিহিক থুইফুরু ছাইক্রাংমানি--
তা কাইজাগদি বুবাগ্রা, তেওয়াইছা তেই তা কাজাগদি;
চেরাই মাংনুইন নুং লবয় নারুগদি;
বুবাগ্রালে থুইজাক বিহিকনি কক ন নারুগলিয়া--
পগয়ছে থাংখানা দ--
তে কাইছা বুরুই হামিয়া ন ছে নগ তুবমালে--
ছাকালছে ছক ফাইখানা না দ !
মা মাতৈনি হামিয়া অংমালে--
বছাজ্লানি--থুইছে বিথি অংখা।
অখ্নাদি--খ্নাদি--যত্তন খ্নাদি--
আইয়াং মাইছিংনি মতাইরগ ব খ্নাদি।
আফুরু তাখুগণুই ন তাননানি বাগয়--
ছিমালুঙ্গছে হরত।

বুবাগ্রা ছামানি কক-ন বা ছাব খিবিনানি মা-ন, ছাদি ।
তাখুগণুইনি তালিখা কাহাম বাইছে--
আফুরু ওয়াতুই নবার ফাইমালে জায়খ্লাই ন,
হা ক্লুই ফাইখা ।
তাখুগণুই বুমা ন রিহিনয় কা-ব--
অ আমা, ফাইদি--ফাইদি--ফাইদি-দাকতিন ফাইদি ।
নছাজ্লারগ তানজা-গ, নাই ফাইদি ।
হা ক্লুইতুতুই বুমানি মাংখরনি হকুছে দবন দবন খ্লাই ফাইঅ ।
আবন নুগুয়দে লগিছং খারমালে
যত্তন খারখা ।
তংমালে দাইজুক বাই বছাজ্লাছে তংঅ ।
দাইজুকনি খাতা মা কতাং--
তাখুগণুই ন বলংঅ তুনই রোঅ ।
দাইজুক কাপতুতুই ছামানি--
খারদিবা আফারগ্, খারদি ।
হাচালনি কামিংঅ থাংঅয় তংগইদি ।
থাংগয় তংখ্লাই তেওয়াইছে মালাইআনু,
থাংদি দাতি আফারগ্ থাংদি ।"

অর্থ ঃ- শ্রোতৃমণ্ডলী শুনুন, আপনারা সবাই শুনুন--। মহারাজার দুটি ছেলে ছিল । রাণী মৃত্যুকালে তাঁকে বলে গিয়েছিলেন--'বিয়ে করো না । তুমি আবার বিয়ে করো না; ছেলে দুটিকে আদর যত্ন দিয়ে দেখে শুনে রেখো । রাজা কিন্তু তার কথা রাখেননি । হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন । রাজা আর একটা দুষ্ট মেয়েলোককে ঘরে তুলে আনলেন; স্ত্রীলোকটি হয়ত রাক্ষসীই হবে । (ছেলে দুটির) বিমাতার অসুখ হলে ছেলেদের রক্ত হল তার ঔষুধ । আপনারা সবাই শুনুন, স্বর্গের দেবতাগণও শুনুন, সে সময় ছেলে দুটিকে কেটে রক্ত আনবার জন্য (জল্লাদের সাথে) শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়া

হল। আপনারাই বলুন, রাজার আদেশ কে লঙ্ঘন করতে পারে ! কুমার দুজনের কপাল ভাল ছিল বলে সে সময় চারদিক অন্ধকার করে পৃথিবী কাঁপিয়ে ঝড় বৃষ্টি এল। কুমার দুজন তখন তাদের মাকে স্মরণ করে কাঁদছে -- ওগো মা, এস, তাড়াতাড়ি এসে দেখ-- তোমার ছেলেদের কেটে ফেলছে; তুমি এসে নিজেই তা দেখে যাও। সে সময় মায়ের শ্মশান থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া বেরুতে লাগল। তা দেখে সংগে যারা যারা গিয়েছিল সবাই পালিয়ে গেল। একমাত্র ধাইমা আর তার ছেলেই শ্মশানে রয়ে গেল। কুমারদের জন্য ধাইমার স্নেহ অপরিসীম। তাই ধাইমা কেঁদে কেঁদে কুমার দুজনকে বনে পৌঁছে দিয়ে বলে দিল--বাবারা আমার, তোমরা পালিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে দূরের কোন পাড়াতে থাক। যাও, বাবারা আমার, তাড়াতাড়ি চলে যাও। বেঁচে থাকলে একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

কুচুং এর গানে উপস্থিত সকলের চোখেই বান ডেকে গেল। রাজাও তার পূর্ব্বকথা স্মরণ করে সিংহাসনে বসে বসে কাঁদছেন ! কারো মুখে রা নেই। রাজা মনে মনে ভাবছেন, তার কুতুং এবং কুচুং থাকলেওতো আজ এ ছেলেটির মতই বড় হতো। কি নিদারুণ কাজই তিনি করেছেন ! এদিকে কুচুং এর গান শেষ হতেই নিনাং গান ধরল ঃ-

"আ বলংনি মতইরগছে বরগ-ন নারুকখা;
আ তাখুগণুই খাব্রুমই খারয় থাংখা।
কুছুছা বা তুই কাংঅইছে লামাঅ ক্রাই তংখা।
অকরা বা তুইনি বাগয় কবর চাঅই থাংখা।
বতান রিহিনয় কাবতুতুইছে লামা নাইছিং তংখা।
অকরাছাবা তুই মাইয়া অংগয় মলংচাই তংখা।
কুছুছাবা লামা ছিনিয়া অই চিরিখগই মামাংছে।
তাবুকব বরগ মালাইমাছে--কাবমাং ছিমিছে তংঅ।

বুফা বুবাগ্রানি খুকনি ককনছে বরগ বা নাই তংঅ।
তাবুকলে বরগ ন-গ ফাইনানি মামাংছে বখা।
বুফা বাহাই তং, বুফান নাইনা বাগয়ছে খা মিরিগয় তংখে।

অর্থ ঃ- বনের দেবতাগণই তাদের রক্ষা করলেন। ভাই দুজনও দৌড়ে পালিয়ে গেল। এক সময়ে ছোট ভাইটি জল পিপাসায় চলতে না পেরে বসে গেল। বড় ভাইটি সে সময় পাগল পাগল হয়ে জল খুঁজতে গেল। ছোট ভাইটি দাদাকে ডাকছে আর পথ চেয়ে আছে। এদিকে জল না পেয়ে বড় ভাইটি কি করবে কি না কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। অচেনা বন পথে ছোট ভাই বাঁদতে লাগল। আজ তারা পরস্পর মিলেছে সত্যি, কিন্তু চোখের জল আজও থামে নি। কুমার দুজন ওদের বাবা, মহারাজার কথার অপেক্ষায় আছে। ওরা আজ ওদের নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে চায়। বাবা কেমন আছেন, বাবাকে দেখার জন্য ওদের প্রাণ চঞ্চল হয়ে আছে।

নিজেরই পূর্ব্ব কথা শুনে কেঁদে কেঁদে রাজা দুঃখের অনুভাপে অবশ হয়ে পড়লেন। তিনি আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। শত চেষ্টা করেও চোখের জলকে বেঁধে রাখতে পারছেন না। গানের মধ্যে দিয়ে ছেলেদের কথা শুনে রাজা ভাবতে লাগলেন, তাহলে তার ছেলেরা বেঁচে আছে। মা বাপ ছাড়া গভীর অরণ্যে অসহায় বাছারা আমার কত কষ্টই না পেয়েছে।

খুব ভাল গান বলে রাজ অন্তঃপুরের দাসদাসীরাও সবাই এসেছে গান শুনতে। একমাত্র রাণী নাইথকতিই অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে গান শুনতে আসেনি। মাইলুমা খাইমাও এসেছে। এত বছরে মাইলুমা খুব বুড়িয়ে গেছে। গানের আসরে এসে অবধি সে কুমার দুজনকে চিনতে পেরেছে। কেঁদে কেঁদে সে গান শুনছে, আর পলকহীন চোখে চেয়ে আছে কুমারদের দিকে। ওইতো কুতুং আর কুচুং। বাঃ ! কত বড় হয়েছে, কত সুন্দর হয়েছে বাছারা আমার।

এদিকে মহরাজার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছিল। তার পক্ষে আর বসে থাকা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। প্রধান অমাত্য ও প্রধান সেনাপতিকে ভর করে তিনি অন্দরমহলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি প্রধান সেনাপতিকে দিয়ে গায়ক কুচুং এবং কুতুংকে ডাকালেন। বাইরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল অন্দরমহল থেকে রাণী নাইথকতি কিছু তার কিছুই জানতে পারল না। রাজার তলবে ছেলে দুটি অন্দরমহলে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মহারাজ ওদের বলতে লাগলেন-- "বাছারা বল, আমার কুচুং আর কুতুং কি বেঁচে আছে ? তোমাদের গান শুনে মনে হল ওরা বেঁচে আছে। বল, ওরা কোথায় আছে ? তোমারা যা চাইবে তাই দিয়েই তোমাদের আমি পুরস্কৃত করব। হা অদৃষ্ট, আমি কি নির্বোধ। আগুপিছু চিন্তা না করেই অবোধ শিশু দুটিকে কি চরম শাস্তিই না দিয়েছি। ওদের মা-ই ওদের বাঁচিয়েছে। ওদের আমি ফিরিয়ে আনব। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব।" মহারাজের অসহায় অবস্থা দেখে কুমার দুজন খুব বিনীত ভাবে বলতে লাগল--"মহারাজ আপনার ছেলে দুটি জীবিতই আছে। তবে আপনি যদি একটা প্রতিজ্ঞা করেন, তবেই আপনার ছেলে দুটি আপনার সাথে দেখা করতে পারে।" "হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই করব"--মহারাজ বললেন। "বল কি প্রতিজ্ঞা আমাকে করতে হবে ?" তখন কুচুং বলল--"মহারাজ, মাতা মহারাণীর অন্দরে একটা বড় সিন্দুক আছে। আপনি ওটা একটু খুলে দেখবেন। এই সে প্রতিজ্ঞা।" মহারাজ ভাবলেন, অন্দরমহলের একটা সিন্দুক মাত্র খুলে দেখতে হবে, এ এমন বিশেষ কঠিন কি ! মহারাজ সাথে সাথেই বললেন--"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখব। আমি এক্ষুণি দেখছি।" রাজার মনে ঘোরতর সন্দেহ জেগে উঠেছে। তক্ষুণি প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও কয়েকজন লোককে ডেকে পাঠালেন। লোকজন এলেই রাজা অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। কুমার দুজন বসে আছে। এমনি সময়ে একজন বুড়ো মেয়েমানুষ লোকের ভীড় ঠেলে সোজা কুমার দুজনের কাছে চলে এল। বুড়ীর চোখে জল। এসেই কুমার দুজনকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। এদ্দিন পরে হলেও মাইলুমা থাইমা কুমার দুজনকে চিনে নিতে

এতটুকুও অসুবিধা হয়নি। ও ঠিকই চিনে নিয়েছে। তবে তক্ষুণি কারো কাছে কিছু প্রকাশ করল না, পাছে কুমারদের কোন রকম বিপদ হয় ! কুমার দুজনও ওদের মাইলুমা ধাইমাকে চিনতে পেরেই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। উপস্থিত সকলেই অবাক ! কেউ ভাবছে, এ দুজনেই কুমার হবে ! তাই মাইলুমা ধাইমা চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। আবার কেউ কেউ বলাবলি করছে, এ দু'জন কুমার নয়। ওরা গানের দলেরই লোক। কুমারদের কথা নিয়ে গান বেধে গেয়েছে বলেই মাইলুমা কুমারদের কথা মনে করে ওদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছে; কুমারেরা অন্য কোথাও রয়েছে।

এদিকে রাজা লোকজন নিয়ে অন্তঃপুরের দিকে যেতে যেতে কেবলই ভাবতে লাগলেন, রাণীর সিন্দুকে কি এমন রহস্য লুকিয়ে আছে ! গায়ক ছেলে দুটিই বা সিন্দুকটা দেখবার জন্য আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাল কেন ! যাই ই থাকুক এক্ষুণি এ রহস্যের সমাধান হবে। লোকজন নিয়ে রাজা অন্তঃপুরের দিকে আসছেন জেনেই রাণীর একান্ত সেবিকা ইঙ্গিতে রাণীকে জানিয়ে দিল। সাথে সাথে রাণী ফটিকরায়কে সিন্দুকে পুরে তালাচাবি লাগিয়ে চাবিটি নিজের কোমড়ে গুঁজে তাঁত বোনায় মনোযোগ দিল। রাজা রাণীর খাস কামরার দরজায় ঢুকেই রাণীর কাছ থেকে সিন্দুকের চাবিটি চাইলেন। সংগে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও অন্যান্য লোকজন। দুশ্চরিত্রা রাণী আচমকা মহারাজের এমন ব্যবহারে খুবই ঘাবড়ে গিয়ে ভাবতে লাগল--মহারাজ তো কোনদিনই সিন্দুকের চাবি চান নি। এমনকি আগে না জানিয়ে অন্দরেও আসেন নি। আজ হঠাৎ করে এসে চাবি চাইছেন কেন ! তবে কি মহারাজ সবই জানতে পেরেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে সাহস হারালে তো চলবে না। এতে দুজনকেই মরতে হবে। তাই রাণী বুকে সাহস এনে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলল--"সিন্দুকের চাবি আমি কাউকে দেব না মহারাজ। এতে আমার অনেক জরুরী জিনিষ পত্র রয়েছে। প্রাণ থাকতে এটা আমি কাউকে দেব না। এছাড়া এ সিন্দুক আমার বাবার দেওয়া, এটা আমি কাউকে ধরতেই দেব না। রাণী যতই আপত্তি জানাচ্ছে মহারাজার

সন্দেহ ততই বেড়ে চলেছে। রাণীর সাথে অনেক কথা কাটাকাটির পর মহারাজ বুঝলেন সিন্দুক কিংবা সিন্দুকের চাবি কোনটাই রাণী সহজে দেবে না। কাজেই জোর করতে হবে। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান অমাত্যকে লোকজন দিয়ে সিন্দুকটি বাইরে নেবার আদেশ দিলেন। রাণী খুবই বেগতিক দেখল লোকজনেরা হয়ত এক্ষুণি ধরাধরি করে সিন্দুকটি নিয়ে যাবে। তাই দৌড়ে গিয়ে রাণী সিন্দুকটিকে আগলে রাখল। রাণীর বুদ্ধিটা হল এই--লোকজনেরা সিন্দুকটিকে ধরতে গেলেই রাণীকে স্পর্শ করতে হবে। প্রধান অমাত্য থেকে শুরু করে কেউই রাণীমার দেহ স্পর্শ করবে না। কাজেই সিন্দুকটিও আর নেওয়া হবে না। মহারাজ দেখলেন ভারী মুস্কিল। রাণীকে সিন্দুকের উপর থেকে না সরাতে পারলে সিন্দুকটা কিছুতেই বাইরে নেওয়া যাবে না। তাই তিনি নিজেই এবার এগিয়ে গিয়ে রাণীকে জাপটে ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে দূরে নিয়ে এলেন। রাণী প্রাণপণ চেষ্টা করেও মহারাজার হাত থেকে ছুটতে না পেরে নিজের চুল টেনে আঁচড়ে নাকি সুরে ভীষণ মায়া কান্না জুড়ে দিল। কিন্তু মহারাজার ভয়ে কাক প্রাণীটিও রাণীকে ছাড়িয়ে আনতে বা সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এল না। মহারাজ আজ ভীষণ চটে গেছেন। যেই এগিয়ে আসবে তারই প্রাণ যাবে।

সিন্দুকের ভিতরে থেকে ফটিকরায় সবই শুনতে পেয়ে মনে মনে ভাবছিল, এবার নির্ঘাত তার মৃত্যু হবে। সেই ভয়েই সে কাঁপছিল। এদিকে সিন্দুকটিকে সবাই ধরাধরি করে সোজা দরবারকক্ষে নিয়ে এল। কুমার কুচুং এবং কুতুং দুজনেই সিন্দুকটিকে দেখে চিনতে পারল। এটিই সেই সিন্দুক যার ভিতরে অনেক দিন ধরে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। আজই সব রহস্যের কিনারা হবে। সিন্দুক দেখে দরবার কক্ষের উপস্থিত সকলের চোখে মুখে অদম্য কৌতূহল জেগে উঠল। সবার মুখেই এক কথা--'কি আছে এ সিন্দুকের ভিতরে ?' এমন সময় রাজা দরবার কক্ষে এসে প্রবেশ করতেই সবাই নীরব হয়ে গেল। সবার সামনেই এবার রাজা সিন্দুকের তালাটি ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিলেন। তালা ভেঙ্গে সিন্দুকের ডালাটি তুলতেই ভিতরে একজন

নাদুস-নুদুস মানুষকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখা গেল। মন্ত্রীতো অবাক্ ! তার মুখে রা সরছে না। এভাবেও মানুষ থাকতে পারে ! রাজা সিংহাসনে বসেই মন্ত্রীকে বলছেন-- 'কি মন্ত্রী, রা করছ না কেন ? কি আছে সিন্দুকটার ভিতর ?' 'সিন্দুকের ভিতর একজন মানুষ'--রাণীর উপপতি একথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল না। তাই সে বলল--'ধর্মাবতার অধর্মের বেয়াদপি মাপ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। মহারাজ স্বয়ংই এসে দেখুন।' রাজা এসে সিন্দুকের ভিতর লোকটাকে দেখে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন-- 'তুই কে ? কে তোকে এভাবে রেখেছে ? কি করে তুই অন্দরে ঢুকলি ?' রাজা লোকটিকে টেনে বের করতে আদেশ দিলেন। লোকটিকে সিন্দুক থেকে বের করে রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সবাই একে একে জিজ্ঞাসা করল। ফটিকরায় কিন্তু কারো কথারই জবাব দিল না। মাথা নীচু করে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ানক রেগে গিয়ে রাজা বেত্রাঘাত করতে আদেশ দিলেন। সংগে সংগে কলকরায় বেত্রাঘাত শুরু করে দিল। বেশ কয়েক ঘা পড়তে না পড়তেই ফটিকরায়ের মুখ দিয়ে কথা সরতে লাগল। সে বলল, তার নাম ফটিকরায়, বাড়ী নিক্রা সর্দারের পাড়া। বিয়ের পর অন্যান্য যৌতুকের সংগে রাজার লোকেরাই বাক্সে করে তাকে বয়ে এনেছে। এসব শুনে রাজা আরও ক্ষেপে গিয়ে আবার বেত চালাতে বললেন। আর দু'চার ঘা পড়তেই ফটিকরায় মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে আবার চলল জিজ্ঞাসাবাদ। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন-- 'বল দিয়ারী সেজে কে এসেছিল ?' '--আমিই রাণীর কথামত এসেছিলাম মহারাজ'--ফটিকরায় বলল। বেত্রাঘাতে জর্জরিত ফটিকরায় অসহ্য যন্ত্রনায় কেঁদে কেঁদে সকল কথাই প্রকাশ করে দিল। রাগে দুঃখে লজ্জায় অপমানে মহারাজার আর মুখ দেখাবার পথ রইল না। লোকটার সারা গা কেচে কেচে নুন ছিটিয়ে দিয়ে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েই মহারাজ তাড়াতাড়ি দরবার কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন।

রাজার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এদ্দিন যাকে তিনি প্রাণের চাইতে বেশী ভালবেসেছিলেন, যার আরোগ্যের জন্য চাঁদের মত দুটি ছেলেকে বধ

করতে আদেশ দিয়েছিলেন, সেই কিনা তার সাথে প্রতারণা করেছে। রাণীর কলঙ্কের কথা রাজ্যময় প্রজারা জেনেছে। তিনি প্রজাদের সামনে কি করে আর মুখ দেখাবেন ! হ্যাঁ, রাণীকে শাস্তি দিতে হবে। তার প্রতারণার জন্য চরম শাস্তি--যা মানুষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীকে ডাকলেন। মন্ত্রী আসতেই রাণী নাইথকতিকে কি শাস্তি দেওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। রাজা দুঃখ করে বলতে লাগলেন--রাণী নখাফিলিক মারা যাওয়ার পর আমি বিয়ে করতেই চাইনি। তোমরা সবাই বলে কয়ে আমাকে রাজী করালে এবং তোমরাই সবদিক দেখে শুনে ভাল বলে রাণীকে এনেছ। কিন্তু আজ দেখতেই পাচ্ছ, রাণী নাইথকতির জন্য আমার মুখ দেখাবার জো নেই। তার জন্যই তোমাদের কথা উপেক্ষা করেই নির্বোধের মত চাঁদমুখ ছেলে দুটিকে জল্লাদের হাতে দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, কুমারদের সহ্য করতে না পেরেই সে কৌশলে ওদের মারতে চেয়েছিল। সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে, আমার সাথে ভালবাসার ভাণ করে অন্দর মহলে স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে গেছে। কুমার দুটি ওদের মা নখাফিলিকের আশীর্বাদে বেঁচেছে বলেই আজ রাণীর সবকিছু কেলেঙ্কারী প্রকাশ পেয়েছে। নয়ত সে চিরদিনই এমনটা চালিয়ে যেত। আজ তুমিই বলে দাও ওকে আমার কি শাস্তি দেওয়া উচিত।"

এমন সময় রাণী নাইথকতির খাসমহলের ধাই এসে মহারাজকে বলল, মহারাজ, শীগগীর আসুন। মনে হচ্ছে রাণীমা বিষ খেয়েছেন। শুনেই রাজা ধাইকে গর্জে উঠলেন--'যা এখান থেকে। পাপিষ্ঠাকে মরতে বলগে। আমি ওর মুখ দেখতে চাইনা।' রাণী নাইথকতি বিষ খেয়ে মরল। যে মুহূর্তে রাণীর সিন্দুকটি অন্দর মহল থেকে নিয়ে এল তখনই রাণী বুঝে নিল এবার তার সব কেলেঙ্কারীর কথাই প্রকাশ হয়ে পড়বে। এসব জেনে রাজা কিছুতেই ওদের ক্ষমা করবে না। তাই নিজেই সে এপথ বেছে নিল।

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে রাজা খুবই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। ধাইমা মাইলুমা এসে রাজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল-- "দুঃখ করবেন না মহারাজ

কপাল মন্দ বলেই আপনার জন্য এমনটা হল। পাপী তার উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে। দেবতাদের দয়ায় কুমার দু'জন যে বেঁচে আছে সেটাই খুব ভাগ্যের কথা।" কুমারদের কথা ভুলতেই রাজা আবার অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি মাইলুমাকে বললেন-- "মাইলুমা তোমার ঋণ কোনদিন আমি পরিশোধ করতে পারব না। একমাত্র তোমার বুদ্ধিতেই কুমারেরা বেঁচে গেছে। কুমারেরা কোথায় আছে তুমি শীগগীর গিয়ে গায়ক দলের কাছে জেনে এস। তাদের দেখতে আমার প্রাণটা আনচান করছে।" কিছুক্ষণ পরেই মাইলুমা কুতুং এবং কুচুং এর হাত ধরে নিয়ে এল। সংগে ওদের স্ত্রী মতম ও নিনাংকে আনতেও ভুলল না। মাইলুমা ধাইমা হাসতে হাসতে রাজার কক্ষে ঢুকেই বলল--"এই নিন মহারাজ, আপনার দুই ছেলে কুমার কুতুং ও কুমার কুচুং। গায়ক দুটি ছেলেই যে কুচুং আর কুতুং একথা মহারাজ ভাবতেই পারেন নি। অনেকদিন পর ছেলেদের কাছে পেয়ে মহারাজ ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ধাইমা মাইলুমা মতম আর নিনাং এর সাথেও মহারাজার পরিচয় করিয়ে দিল।

রাজা ফান কারাক বুড়ো হয়েছেন। আগের মত আর তড়িঘড়ি রাজকার্য চালাতে পারেন না। তাই কুমার কুতুংকে রাজ্যভার দিয়ে অবসর নিতে মনস্থ করলেন। মাইলুমা ধাইমাকে পুরস্কার স্বরূপ অন্দর মহলের প্রধানা করে দিলেন। শুভদিনে অভিষেকের পর কুতুং রাংগামাটির সিংহাসনে বসল। বড়ভাই কুতুং রাজা হয়ে ছোট ভাই কুচুংকে তার মন্ত্রী বানাল। রাজ্যজুড়ে প্রজারা খুব আমোদ আহ্লাদ করল। পূর্ব্ব উপকারের প্রতিদান স্বরূপ বাছাল সর্দ্দার খা-কলক, কলাং সর্দ্দার, বগলা, ছামলা প্রভৃতি প্রত্যেককে রাজধানীতে এনে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে রাজদরবারে ঠাঁই করে দিল। দীর্ঘদিন পাহাড় অঞ্চলে সাধারণ প্রজাদের ঘরে সাধারণ ভাবে থেকে থেকে দুভাই-ই সাধারণ প্রজাদের দুঃখ কষ্টের কারণগুলো খুব ভালভাবে বুঝেছিল। রাজ্যের শাসনভার পেয়েই তাই ওরা প্রথমেই সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করতেই সচেষ্ট হল। নুতন রাজা মন্ত্রীর সুশাসনে প্রজাদের মুখে মুখে তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। নিনাং আর মতমও খুব মিলেমিশে অন্দর মহলের সব কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে

লাগল। বুড়ো রাজা ফান কারাকের কাছে কাছে থেকে সব সময় সেবা যত্ন করতে লাগল। প্রজারা সুখে শান্তিতে থেকে রাজা মন্ত্রীকে দীর্ঘজীবি করার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

বুড়ো রাজা ফান কারাকই আজ সবচাইতে সুখী। শাসনকার্যে ছেলেদের পারদর্শিতায় তিনি মুগ্ধ। ছেলে-বৌদের দিনরাত্তির সেবা যত্নে তার সব দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে একদিন বুড়ো রাজা ফান কারাক দেহত্যাগ করলেন। কুতুং ও কুচুং খুব সমারোহ করে মহারাজার শ্রাদ্ধাদি কাজ সমাধা করল। এদ্দিনে দু'ভাই তাদের স্নেহময় বাবাকে হারাল। আওয়াতক্কে।

--পাইখা--